

কামারুজ্জামানের ভিঠি এবং জামায়াতের সংস্কার প্রসঙ্গ

Bangladesh: Reclaiming the Narrative

বহুল আলোচিত জামায়াত সংস্কারের সেই মিটিং

পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে নতুন কর্মকৌশল গ্রহণ সময়ের দাবী

বিবেচনায় আনতে হবে সবকিছু

ইসলামী আন্দোলনে হীনমন্যতাবোধের সুযোগ নেই

Do Islamists Need a Way Out

আরব বসন্ত এবং দেশে দেশে ইসলামী আন্দোলন

জীবনের সর্বক্ষেত্রেই রাসূল (সা) এর আদর্শকে অনুসরণ করতে হবে

সম্পাদনা

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

কামারুজ্জামানের চিঠি এবং জামায়াতের সংস্কার প্রসঙ্গ

কামারুজ্জামানের চিঠি এবং জামায়াতের সংস্কার প্রসঙ্গ

সম্পাদনা

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক



সিএসসিএস পাবলিকেশন্স

কামারুজ্জামানের চিঠি এবং জামায়াতের সংস্কার প্রসঙ্গ

সম্পাদনা: মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

প্রকাশক

সিএসসিএস পাবলিকেশন্স

অস্থায়ী কার্যালয়: এসই-২৮, দক্ষিণ ক্যাম্পাস

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

© সিএসসিএস

প্রথম প্রকাশ

এপ্রিল ২০১৫

মূল্য

২২০ টাকা

Kamaruzzamaner Chithi ebong Jamaater Songskar Prosonga (Letter of Kamaruzzaman and the Reform Issue of Jamaat), Edited by Mohammad Mozammel Hoque, Published by CSCS Publications, Temporary Office: SE-28, South Campus, Chittagong University. E-mail: connect.cscs@gmail.com, web: cscsbd.com. Price: BDT 160.00

উৎসর্গ

গঠনপর্ব হতে শুরু করে আগামী দিনের বাংলাদেশ প্রসঙ্গে
'ইসলাম' ও 'রাজনীতি'র অন্তঃসম্পর্ক পাঠে আগ্রহীদের উদ্দেশ্যে

সম্পাদকের বক্তব্য

বাংলাদেশ ও সমকালীন বিশ্বের প্রেক্ষাপটে ইসলাম, রাজনীতি, ধর্মীয় রাজনীতি, রাজনৈতিক ইসলাম, মৌলবাদ, ইসলামী আন্দোলন—এ ধরনের কনসেপ্ট নিয়ে জানা ও গবেষণার কাজে যারা আগ্রহী হবেন তাদের জন্য বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সাবেক সিনিয়র সেক্রেটারী জেনারেল মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের একটি চিঠি ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি গুরুত্বপূর্ণ দলীল হিসাবে বিবেচিত হবে।

প্রধানত যুক্তরাজ্য প্রবাসী জামায়াত নেতৃত্বের উদ্যোগে *Bangladesh: Reclaiming the Narrative* শীর্ষক একটি সংস্কার প্রস্তাবনা ২০০১ সালের পরে বাংলাদেশের শীর্ষ জামায়াত নেতৃত্বদের কাছে পেশ করা হয়। মুহাম্মদ কামারুজ্জামান কর্তৃক জেলখানা থেকে পাঠানো সুদীর্ঘ চিঠিটি দৃশ্যত এই ধারণাপত্রের আলোকে লিখিত। জামায়াত সংশ্লিষ্ট নানা মহলের সাথে যোগাযোগ করে ইংরেজিতে লেখা প্রবন্ধটির এক ধরনের অথেনটিসিটির আভাস পাওয়া যায়। বিশেষ করে কন্টেন্ট বিবেচনা করে এই প্রবন্ধটিকে সংকলনে স্থান দেওয়া হয়েছে।

আলোচিত ‘পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশানে’র ঘটনা জামায়াত ঘরানার অনেকেই জানেন। এ নিয়েও প্রত্যক্ষ কোনো ‘প্রমাণ’ নাই। পরিশিষ্ট-১ এ গ্রন্থিত এ সংক্রান্ত কী-নোট পেপারটি নির্ভরযোগ্য সূত্র হতে প্রাপ্ত। বিষয়টা নিয়ে নানা পর্যায়ে অনুসন্ধানের প্রেক্ষিতে মনে হয়েছে পাঠক ও গবেষকদের জন্য এটি প্রয়োজনীয় হতে পারে।

জেল থেকে পাঠানো জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের সংস্কার প্রস্তাবনা সম্পর্কে জামায়াতের জনশক্তির মাঝে স্বভাবতই ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় জামায়াতের মহিলা বিভাগের প্রধান শামসুন্নাহার নিজামী কোরআন-হাদীসের ব্যাপক উদ্বৃতিসহ *বিবেচনায় আনতে হবে সবকিছু* শিরোনামে একটা পাল্টা বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এই সাঁড়াশি আক্রমণে কামারুজ্জামানের সংস্কার প্রস্তাবনাটি ক্রমেই থিতুয়ে পড়ে।

জনাব শাহ আবদুল হালিমের *Do Islamists Need a Way out?* শীর্ষক এই প্রবন্ধটি নেতৃত্বকে সংগঠনের যুগোপযোগী সংস্কার গ্রহণের জন্যে সম্মত করানোর কাজে জামায়াতের বুদ্ধিজীবী মহলের দৃশ্যত ধারাবাহিক ‘ব্যর্থতা’র অন্যতম নজীর। শীর্ষ জামায়াত নেতৃত্ব কখনো এসব সংস্কার প্রস্তাবকে ইতিবাচক হিসাবে বিবেচনা

করেনি। বরং এ ধরনের লেখালেখিকে সুবিধাবাদীতা ও আপসকামীতা হিসাবে বিবেচনা করে তাদেরকে ‘সংগঠনিক রীতি-নীতি ভংগের’ অভিযোগে তিরস্কার করেছে।

রিফর্ম ইস্যু নিয়ে এই পর্যায়ে সুপরিচিত আইনজীবী ও কেন্দ্রীয় জামায়াত নেতা ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক *আরব বসন্ত ও দেশে দেশে ইসলামী আন্দোলন* শীর্ষক একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। জামায়াত মহলে তাঁর ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতার কারণে এবং জামায়াতপন্থী দৈনিক নয়াদিগন্তে প্রকাশিত হওয়ায় প্রবন্ধটি নিয়ে রীতিমতো হৈ চৈ পড়ে যায়। সংস্কারের এই ক্রমবর্ধমান চাপকে নিষ্ক্রিয় করার লক্ষ্যে এ পর্যায়ে পাল্টা বক্তব্য দিতে এগিয়ে আসেন অধ্যাপক এ কে এম নাজির আহমদ। জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় তিনি ব্যারিস্টার রাজ্জাক উপস্থাপিত সংস্কার প্রস্তাবকে খণ্ডন করে বক্তৃতা করেন। জামায়াত নেতৃত্বের মন-মানসিকতা বুঝার জন্য এটি সহায়ক হতে পারে। তিনি জামায়াতের সিনিয়র দায়িত্বশীল ছিলেন। আমৃত্যু তিনি ছিলেন জামায়াতের সম্ভবত একমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিক ফোরাম ‘বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার’ এর পরিচালক। অঘোষিতভাবে তিনি ছিলেন জামায়াত-শিবিরের যে কোনো অভ্যন্তরীণ শীর্ষ পর্যায়ের নির্বাচনের একচ্ছত্র পরিচালনাকারী। ব্যক্তিজীবনে ছিলেন অত্যন্ত নির্মোহ। সংগঠনের ব্যাপারে ছিলেন ‘সংগঠনবাদীতার’ মূর্তপ্রতীক।

যাহোক, জামায়াতের সংস্কার ইস্যুর ওপর একটি সিদ্ধান্তমূলক নিবন্ধ লিখে পাঠান সংগঠনটির কারান্তরীণ এক নম্বর ব্যক্তি মাওলানা নিজামী। ‘আবু নকীব’ ছদ্মনামে লেখা *ইসলামী আন্দোলনে হীনমন্যতাবোধের সুযোগ নেই* শিরোনামে প্রত্যুত্তরমূলক এই নিবন্ধটি জামায়াতপন্থী পত্রিকা দৈনিক সংগ্রামে ছাপানো হয়। এটি লিফলেট আকারে জনশক্তির মাঝে ব্যাপকভাবে পৌঁছানোর ব্যবস্থাও করা হয়।

জনাব কামারুজ্জামানের সংস্কার প্রস্তাবনাটির সূত্রগত সত্যতা নিয়ে নানা মহলে, বিশেষ করে ‘সংগঠন-প্রাণ’ জামায়াতের জনশক্তির মাঝে, কিছুটা সংশয় ছিলো। এর কারণ হলো মূলধারার জামায়াত নেতৃত্ব কর্তৃক একে যথাসম্ভব অস্বীকার করার প্রবণতা। ইতোমধ্যে এই চিঠির পাণ্ডুলিপি অনলাইনে প্রকাশিত হওয়ায় তা বইটির পরিশিষ্টে সংযোজিত হলো।

কোরআন ও হাদীস মোতাবেক সামষ্টিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে দ্বিমতের বিষয়গুলো প্রকাশ্যে উপস্থাপন করার সীমা বা ক্ষেত্র যা-ই হোক না কেন, জামায়াত যে কোনো বিষয়ে তাবৎ দ্বিমত ও সমালোচনাকে যথাসম্ভব নিরুৎসাহিত করে। উপরন্তু এসব বিষয়কে অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও গোপনীয় হিসেবে বিবেচনা করে। বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ার মারফতে এর ভিতরকার অনেক কিছুই এখন প্রকাশ হয়ে পড়ছে। স্বীয় বৃহত্তর জনশক্তির নির্দোষ সেন্টিমেন্ট এবং পরীক্ষিত ও ত্যাগী বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর সময়োপযোগী ও বিশ্লেষণমূলক কোনো পরামর্শকে সংগঠনটির শীর্ষতম নেতৃত্ব কখনো সুনজরে

দেখে নাই। সংগঠনবাদী ও সংস্কারপন্থীদের এই দৃশ্যমান দ্বন্দ্ব নিরসনে জামায়াত ভবিষ্যতে কী করবে তা কেবলমাত্র ভবিষ্যতেই জানা যাবে।

জামায়াত কখনো স্বতঃস্ফূর্ত ও স্থায়ী সংস্কারে ব্রতী হবে না— আজ থেকে পাঁচ/সাত বছর আগে খুব কম লোকেই তা বিশ্বাস করতো। আমি তাদের অন্যতম। ২০১০ সালে আমি ‘সোনার বাংলাদেশ’ ব্লগে জামায়াত সম্পর্কে আমার বক্তব্য তুলে ধরেছিলাম, যা ‘ফোর পয়েন্টস’ হিসাবে পরিচিত। তখন আমার বিভিন্ন লেখায় নানাভাবে তা তুলে ধরেছি। এর মূল কথা হলো: (ক) জামায়াত কখনো কোনো স্বতঃস্ফূর্ত ও মৌলিক পরিবর্তনকে গ্রহণ করবে না। (খ) নানা কারণে এই মুহূর্তে বিকল্প জামায়াত প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও বাস্তবসম্মত নয়। (গ) ‘ইসলামী আন্দোলনে’র ধারণা মোতাবেক ‘দেখি না কী হয়’, ‘অন্যরা করুক’, ‘আমি তো বলেছি’ বা ‘সবাই করলে আছি নয়তো নাই’— এই ধরনের মনোভাবও গ্রহণযোগ্য নয়। (ঘ) অতএব, সংশ্লিষ্টদের উচিত নতুন শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের ধারণাকে পুনর্গঠনের কাজ করে যাওয়া। শেষ পর্যন্ত কী হবে— তা সময়ই বলে দিবে।

২০১০ সাল হতে আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় জামায়াতের গঠনমূলক সমালোচনা এবং ইসলামী আন্দোলনের আগামী দিনের রূপরেখা কেমন হওয়া বাঞ্ছনীয়, তা বলে আসছি। এসব লেখালেখির দুটি পৃথক সংকলন শীঘ্রই প্রকাশের ইচ্ছা আছে। অতএব, এই সংকলনকে আমার পক্ষ হতে ‘জামায়াতের সংস্কার প্রস্তাবনা’ হিসাবে মনে করা ঠিক হবে না। উৎসর্গে যেমনটা বলেছি *গঠনপর্ব হতে শুরু করে আগামী দিনের বাংলাদেশ প্রসঙ্গে ‘ইসলাম’ ও ‘রাজনীতি’র অন্তঃসম্পর্ক পাঠে আগ্রহীদের উদ্দেশ্যেই* এই সংকলন। এই লেখাগুলোর দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট লেখকবৃন্দের। আমার অতীত রাজনৈতিক জীবনের সাথে এই সংকলনের কোনো প্রকার সম্পর্ক নাই। ‘সমাজ ও সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র’ তথা সিএসসিএস-ই আমার বর্তমান মতাদর্শিক পরিচয়। আশা করি বিদগ্ধ পাঠক এ বইটিকে নিতান্ত একাডেমিক দৃষ্টিকোণ হতে দেখবেন।

১৭ এপ্রিল ২০১৫
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক
mozammel.philosophy@gmail.com

সূচি

১। Bangladesh: Reclaiming the Narrative	১৩
- সংগৃহীত	
২। বহুল আলোচিত জামায়াত সংস্কারের সেই মিটিং	২৭
- আরিফুর রহমান	
৩। পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে নতুন কর্মকৌশল গ্রহণ সময়ের দাবী	৩১
- মুহাম্মদ কামারুজ্জামান	
৪। বিবেচনায় আনতে হবে সবকিছু	৫১
- শামসুন্নাহার নিজামী	
৫। Do Islamists Need a Way Out	৬৫
- শাহ আব্দুল হালিম	
৬। আরব বসন্ত এবং দেশে দেশে ইসলামী আন্দোলন	৮৭
- ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক	
৭। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই রাসূল (সা) এর আদর্শকে অনুসরণ করতে হবে	৯৩
- অধ্যাপক এ কে এম নাজির আহমদ	
৮। ইসলামী আন্দোলনে হীনমন্যতাবোধের সুযোগ নেই	৯৫
- মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী	
পরিশিষ্ট	
পরিশিষ্ট-১: রাজনৈতিক সংস্কার কৌশল	১০৩
পরিশিষ্ট-২: মুহাম্মদ কামারুজ্জামান লিখিত চিঠির স্ক্যান কপি	১৩১
পরিশিষ্ট-৩: English Translation of Kamaruzzaman's Letter	১৬৭

Bangladesh: Reclaiming the Narrative*

A way forward strategy for the Islamic Project

Abstract

What follows are some ideas about how we get out of the present quagmire and make a decisive move to bring about the eventual change in our country which we all desire. The success of this very humble effort will lie if these tentative ideas lead to a concrete decision taken at the appropriate level.

It will not take the route of starting with SWROT analysis which is the traditional way of putting together a strategic plan. However, in developing this all earlier reviews and analysis, laboriously carried out over the years, were taken into account. It has also benefited from a pro-active, bottom-up process of consultation with the help of the numerous comments, suggestions and proposals received from our anxious colleagues from around the world.

It has to be said however, despite the current impasse we can Alhamdulillah, proudly point to a range of successes our movement has achieved over the years. These include, a dedicated workforce ready to give any sacrifice, a sizeable popular support base, making a presence almost in every profession, gaining reasonable popular recognition of Islam as an alternative system of life and governance, presenting a large selection of Islamic literature to the nation, making some electoral and political gains including two cabinet ministers who achieved wide spread acclaim for honesty

* ২০০১-০৬ পর্যন্ত তৎকালীন চারদলীয় জোট সরকারের আমলে এই সংস্কার প্রস্তাবনাটি প্রধানত যুক্তরাজ্য প্রবাসী জামায়াত নেতৃত্বের পক্ষ থেকে দলটির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ববৃন্দের কাছে উপস্থান করা হয়েছিল।

even by the enemies; the list goes on. However, the tsunami that hits us today very quickly negated much of these and even threatens to consign us as a mere footnote to history. As a movement that has the courage of conviction to turn the tide we refuse to surrender to adverse conditions and are determined to translate threats into opportunities with sagacious visionary planning.

The paper argues that sustainable change will first of all require reclaiming the narrative we have lost. Part of this must focus on re-thinking the way we present Islam to the society with more emphasis on Islam's broad civilisational appeal and its contribution in building a tolerant, cohesive society. The new narrative must form the essential core of the initiatives for change. It proposes three distinct strands for the whole project. Each to deliver a number of allied objectives; it advocates plurality of organs rather than a monolithic centralised entity. In developmental strand, more emphasis to be placed on education and human resource development. The organisations to maintain arms length distance between each other with no apparent structural link. In the political field it presents a number of alternatives for the consideration of the policy makers.

Introduction

Our world is changing and changing fast. China and India is growing in strength while, according to the US National Intelligence Council's (NIC) most recent global trends review (2008), the European Union (EU) 'will be losing clout by 2025 and will be left like a hobbled giant'. Europe because of its 'democracy gap' will be unable to translate its economic power into global influence. The report also predicts that by 2025 the United States will become 'less dominant and no longer be able to call the shots without the support of strong partnerships'. This may be one of many studies being published in recent times but the underlying conclusions remain almost same or similar. That 'need of partnership' led the decaying powers to look for emerging powers in different parts of the world opening up new opportunities for local aspirants like India.

True, smaller nations such as Bangladesh may not figure in such analysis, as it is nothing more than a tiny speck in such a vast landscape. However, tomorrow's world is as important for the small nations as it is for the world powers, perhaps even more so. In terms of population Bangladesh is now forth largest Muslim nation in the world, yet it stands in splendid isolation marooned from the rest of the Muslim Ummah. The strategic risks such isolation entails makes visionary planning for a sustainable future an urgent policy imperative.

Project-Islam is undergoing a monumental crisis around the world, more so in Bangladesh. Muslim culture in the country today faces such a powerful adverse current as underlined by recent most disturbing developments, that it has the potential to strike a fatal blow to the future of Islam itself. The whole social narrative has shifted from 'Islamic-ideological' or at least 'Muslim-cultural' angle to 'secular-ideological, ethnic/linguistic nationalistic' angle. Wilful distortion and excess by a whole range of political, academic and cultural opportunists coupled with sustained cultural onslaught from across the borders has already contributed to unparalleled level of misinformation and stifling of truth. This has in turn contributed to widespread and artificial tension in the society culminating in the current crisis.

We have lost the Narrative

With the narrow support base and wide spread antagonism Muslim activism now faces it appears almost unthinkable that Islam will ever form the basis of a drive to reordering social change in the country. In spite of increased religiosity and noticeable level of ritualistic observances Islam in our society has already been reduced to private sphere and are forced to fight even to hold on to that little corner. Relentless surge continues to erase the last traces of Islam from our history, our culture and even our language, so much so that Islam is now in real danger of being consigned to the archives of the Museums. In short Islamic movement in our society has lost the narrative.

It is only a matter of time before we lose the last remaining hold. It is not just non-Muslims who are wary about Islam, today large section of secular Muslim elite has also moved far away from it to the extent that Islam has ceased to be a key factor in our society. There was a time when the whole society rested on cultural and civilizational moorings of Islam – not any more. In the words of Ali Allawi, ‘it appeared to be only a matter of time before Islam would lose whatever hold it might still have had on the peoples and societies of the Muslim world’. No where it is truer than in Bangladesh.

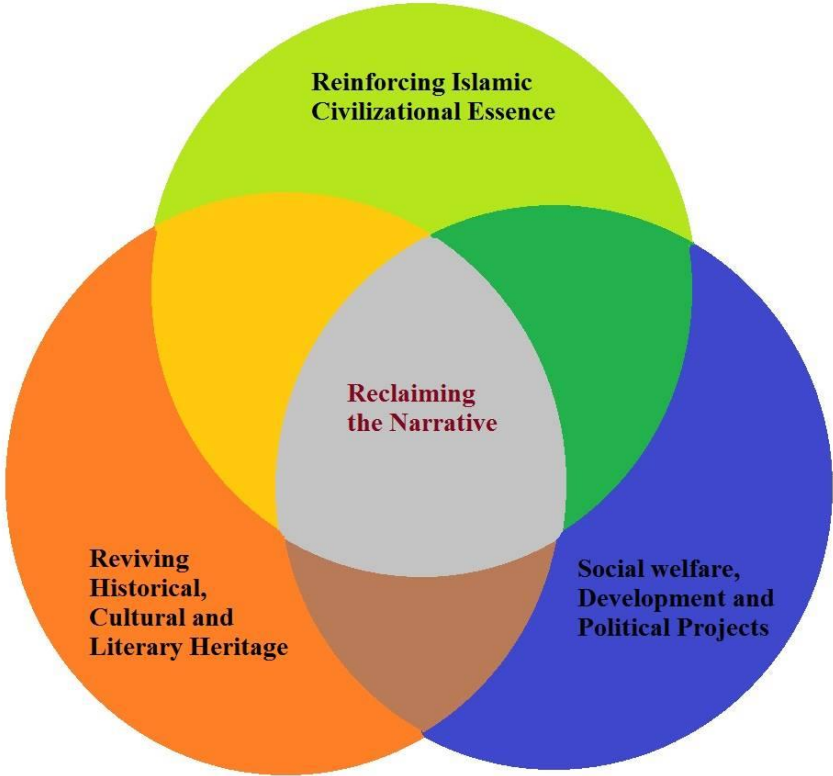
The false narrative that underpins the entire thought process of today’s Bangladesh and largely shapes the social, cultural and academic vistas of our society did not stem from 1971 war, it was planted in our soil long before that, if anything 1971 is a by product of this narrative. What is remarkable is how durable this narrative has proven to be. In the forty years since 1971 it helped promote a hate-soaked formula that continues to drive our political and cultural discourse leading to a backlash and conflict and threatening the whole fabric of the society.

Planning for a beautiful tomorrow

This is not the time to point fingers or apportion blame, rather the priority today is to focus on a far-reaching visionary project which will, Allah willing, frustrate the schemers and ultimately turn the tide in favour of a beautiful tomorrow that our unfortunate land rightly deserve. There is no reason why small nations should not review their past and present and plan their future. At the end of the first forty years of the countries existence it is important to embark upon a mapping project to investigate all aspects of the nation and try to point to a future direction.

Mapping however is not an end in itself unless it leads to a carefully planned project to reclaim the lost narrative. For, it will be necessary to evolve a new national consensus which will take its root from that reclaimed narrative in planning for a future direction of our nation. The project to reclaim the lost narrative will have

three components governed by a central core which is reclaiming the narrative itself. It will look like something like this:



The three strands of the project will be driven by a vision that encompasses the final goal of this journey we set for ourselves.

Vision

The central purpose of the project will be:

“To change Bangladesh into a poverty-free, just and prosperous society firmly anchored to its Islamic civilizational moorings.”

Narrative

Reclaim the lost Muslim cultural and civilizational narrative by dispelling the false anti-Muslim narrative that largely rule today’s

thought process through extensive academic research, publication and subtle awareness building measures.

Planning Objectives

1. Think deep and discover the root causes of opposition
2. Develop insight into the history and socio-cultural trends
3. Regain the control of the academic narrative in all fields

Three central component or strands of the project has to be addressed next.

Reinforcing Islamic Civilizational Heritage

The deep antagonism that is endemic in our society about an idea which is in essence liberal liberating makes no sense. Is it to do with the way we present or mis-present Islam? Or is it because of the way society tried to make sense of the Islamic social order. Perhaps our own understanding of Islam and Islam-inspired social change may have something to do with it.

The ideological template we use to understand Islam makes it limited and limiting which impedes thinking about Islam in morally relevant ways, in turn it prevents others to feel solidarity to Islam and Muslims. The broad, inclusive nature of Islamic civilization was once able to accommodate communities and faith groups and lead a tolerant, understanding and cohesive society. That, and not the insistence on doctrinal limitation, was the key to our success both around the world and in Bangladesh.

Planning Objective

1. Carry out an audit of Islamic literature in Bengali and identify the gaps.
2. Through new research and produce literature articulating the core concepts of Islam guided by the universal and accommodating ideals of Islam.

Reviving Historical, Cultural and Literary Heritage

The very first thing in any project of shaping the future of a society has to begin with placing its history in correct footing. With the

twist and turns of time history itself gets tempered with and finds itself far removed from reality. History is the single most important ingredient to motivate a society. Wrong interpretation of history stifles national spirit and curbs development and progress. Like the history of many countries around the world, history of Bangladesh also deserves to be cleansed from the layers of misrepresentation and analysed to re-establish the facts, because as journalist par excellence, Guardian editor CP Scott once famously commented, ‘...but fact is sacred’.. Not just written history and not just the history since the 1971, the history uploaded on the Wikipedia at great expenses by some interested parties deliberately distorts facts about our Muslim heritage. For example, in the Wikipedia, the Muslim liberator of Bengal Ikhtiar Uddin Muhammad Bakhtiar Khilji is depicted as an ‘invader’ who has ‘raided’ and ‘destroyed’ and ‘committed documented executions’. Only a sentence in the **Legacy** section says, ‘Bengali poet Al Mahmud composed a book of poetry titled **Bakhtiarer Ghora** meaning the Horses of Bakhtiar in early 1990 depicting Khilji as the *praiseworthy* figurehead of the conquest of Bengal.’

Language and Literature

For Bangladesh history of the language and literature is integral with the history of the nation itself and as important. A close look at the origin and development of the Bengali literature will dispel great deal of misconception which now not only prevails in the society but taken the status of conventional wisdom in this subject area.

Muslims played a key role in embracing peoples and cultures and bond them together into a cohesive society in Bangladesh. Islam came to Bengal through traders, travellers and Sufi saints long before the Muslim rule took its root in the country. Oppressed people of Bengal welcomed the new faith for its liberating concept of equality of men, justice and fairness. Communities were allowed ample autonomy to grow according to their own religious, cultural and family values during the Muslim rule. For example rulers like Alauddin Hussain Shah (late fifteenth to early sixteenth century)

commissioned Hindu scholars to produce the very first Bengali translation of Hindu religious texts Ramayana and Mahabharata.

The history stands witness that Muslims rulers not only respected local faiths and cultures, they even provided for the upkeep of their places of worship and observation of their festivals. Tolerance and respect for each other promoted by Muslims helped create a cohesive society in Bangladesh for centuries.

Planning Objectives

1. Inculcate a culture of tolerance and cohesion by imitating once again the warmth and the open-arm embrace of the Master of Madina.
2. Produce properly evidenced publications on the Impact of Islam in shaping Bangladeshi culture.
3. Through research present the history of how Islam promoted a tolerant and inclusive society in Bengal.
4. It is important to embark upon a research project on compiling the true history of Bangladesh.
5. Reproduce the facts about Muslim nature of the original Bengali language, vocabulary and literature.

Social Welfare, Development, Educational and Political projects

Direct political participation is just one aspect of the vast agenda of bringing about a total social change. To achieve this it will be necessary to temporarily move beyond a solo focus on party political project. It is crucial to understand that more and urgent emphasis on social welfare and developmental initiatives is a necessary re-balancing needed to ultimately reclaim the initiative in political field. As the Qur'an states Allah Subhanahu wa Ta'ala commands us to establish justice and welfare, the fundamental objective of Shari'ah or 'Maqasid al-Shari'ah' is defined as 'attainment of good, welfare and warding off evil, injury and loss for the creatures'; it is imperative that is precisely where any project of Islamic change should initiate its journey. Participation

in political process is nothing more than a means to attain this central goal. Whether to increase its scale and level or scale it down is merely an operational strategy.

Education

Making education available for all is an essential prerequisite in the attempt for attainment of common good. This is also necessary for transmitting the new narrative reclaimed and evolved by the first two strands of the project. The educational movement we propose will begin from Maktabas to post graduate research studentship. A massive country-wide network of Maktabas should be launched with a carefully constructed curriculum which will move on to understanding the meaning of Quranic texts and core concepts of Islam after students complete learning the reading of the Quran. A programme of non-formal learning should be introduced to fast-track education for millions of urban and rural dispossessed children urchins and drop-outs. The projects are to be delivered with minimum infra-structure costs by using making use of Mosque buildings during the time they remain largely unused (i.e; from Fajr to Zuhr prayers). Through scholarships and supplementary tuition programmes secondary and college students to be empowered as well. Projects to direct talented students to specialisation and post-graduate qualification should also be launched.

In the Political Arena

Our greatest challenge however lies in the political arena. In order to capitalise on the benefit generated by the works of other strands we need to think deep and devise a political strategy that will ultimately achieve our core objectives risking a catastrophic setback. Rather than providing a definitive or prescriptive solution this paper presents the following alternatives for the consideration of the policy makers.

Option 1

Maintaining the present status	Advantage	Drawbacks
<p>Party continues as before both in packaging and content, keeps the alliance intact. Participates in electoral politics and maintains its vocal opposition to the external forces.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Will promote an undaunted image to some sections. • Will be liked by the partner and opponents. • Ensure continuity. 	<ul style="list-style-type: none"> • Will continue to carry the burden of the past. • Will be extremely hard to ignite the public enthusiasm. Risk of losing substantial HR. • Electoral outcome is unlikely to improve. • Core objective will remain unattainable.

Option 2

Adopts a new name	Advantage	Drawbacks
<p>Party repackages itself in a new name and constitution. Participates in electoral politics and maintains its vocal opposition to the external forces.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Will temporarily confuse the critiques. • Will initially be liked by opponents. • Will preserve at least some of the HR. 	<ul style="list-style-type: none"> • Burden of the past may still continue to hunt. • Public participation may still remain marginal. • Electoral outcome is likely to remain iritic. • Chances of achievement of the core objective will still be remote.

Option 3

A two-pronged approach	Advantage	Drawbacks
<p>In the present climate political work could be handled by dividing work in two distinct parts:</p> <p>First, a scale down version of the present party retaining same name and a reduced existence while openly announcing its disengagement from electoral politics.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Will help to keep our resources intact. ● It will act as a decoy to ensure that attention of others remain focused on it leaving the second to work smoothly without attracting much attention. ● Will satisfy the insistence of the opponents of making us disengaged in the politics, for now. ● Will help preserve most of our HR by relocating them. ● Will act as a moral power house. ● Will keep an arm's length distance with all other activities and not have any visible link with other organisations or activities, social, cultural or political. ● With political disengagement burden of the past will more or less disappear. ● The allies will be content to have access to our electoral power base without having to share seats. ● The disengagement in electoral process may allow time to construct a solid foundation in preparation to stage a meaningful re-entry. 	<ul style="list-style-type: none"> ● There will be no direct role in politics. ● Political disengagement may be considered as a climb down by some of us. ● Low level antagonism may still continue. ● Achievement of the core objective will be outsourced. ● May initially present a passive image. ● Keeping an arms-length distance with other organs may not prove to be easy.

<p>Second, an organisation with a neutral name where most work force will congregate and engage primarily in social, cultural and welfare activities and for the time being keeping away from electoral politics. It will be able to carry out most of the preparatory work for bringing about eventual change. It will be tasked to translate the changed narrative into political programme.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Rising above confrontational positioning will help build a wide coalition. ● Will be able to generate genuine popular appreciation through a social welfare network. ● Engagement in a wide ranging educational and human resource development project will help build a more sustainable foundation. ● Re-branding with a view to be Islamic in essence, not just in packaging will help achieve broader support base. ● By bringing about a public relations revolution from within the existing media it will be able to repair the image problem. ● Charting a foreign policy strategy priorities by recalibrating our relations with both global and local super-powers will make our future role more viable. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Politically motivated workforce may initially find it frustrating. ● Some may think it will lack the clout needed for building coalition and network. ● May also be seen as making too many concessions to the others. ● Recalibrating external relations could be seen as sign of weakness. ● As our HR is not used to quick adaptation they may find a new name strange at the beginning and take time to adjust with it. ● Rising above. Confrontational politics may prove to be hard to practice. ● Temptation of immediate involvement in electoral politics may prove too overpowering. ● Translating the narrative into practical political programme may prove to be a very challenging undertaking. ● Allowing different organs (i.e; Social, educational, economic and HR development) may prove difficult with our long-standing training of central-control.
---	--	---

Human Resource Development

Efficient development and use of human resource is the key in planning for our future success. It will be a part of the project under any of the above options but more importantly for the Second strand of the third option. Because during the uncertain time of managing change there will be real risk of disenchantment and large number of ‘drop-outs’. It will be a crucial part of the programme of the Social, developmental and Political Strand to plan for human resource management without any wastage.

Such work will include:

- Effective planning and redistribution of existing HR.
- Retraining to adjust with new realities and new thinking.
- Recruitment through academic, cultural and social welfare initiatives.
- Channelling trained and motivated HR to crucial sectors to achieve agreed outcomes.

Social Welfare, Developmental and Economic Area

Welfare and developmental activities could be carried out by one or a number of separate welfare NGOs, in general understanding with, but not directly controlled by the second organisation. Together they will be responsible to create a selfless welfare culture helping, assisting, supporting and developing the fabric of the society and addressing its needs. The areas of work it/they should cover will be some of the following.

Planning Objectives

1. Mapping economic assets of Bangladesh and rethinking their innovative utilisation.
2. Developing ready-built low-cost housing.
3. Developing large-scale employment strategies and income generating enterprises.
4. Back to basics: developing strategies to reignite interest in agriculture and fishing.

5. Developing ideas for export oriented small-scale business.
6. Launching creative initiatives to help women to play a role in nation building.
7. Strategies for regenerating villages and making rural life sustainable and attractive again.
8. Developing self-sustaining energy programmes.

Conclusion

The above is by no means an exhaustive list of ideas and alternatives, they are just some pointers for our decision makers to think and decide our future course of action. Our task ahead is no doubt challenging and onerous, but Allah willing, challenge will never defeat the free spirit of Allah-conscious Mumin. Rethinking and revising, planning and charting a different yet effective strategy has always been a gift of prophetic wisdom. It is not bowing to pressure but a firmness of *Istiqamat*.

বহুল আলোচিত জামায়াত সংস্কারের সেই মিটিং*

আরিফুর রহমান

জামায়াতে ইসলামীর নাম পরিবর্তন কিংবা নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠন করা যায় কি না, তার একটি উদ্যোগ নিয়েছেন এই দলেরই নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা। একাত্তর সালে স্বাধীনতারবিরোধী ভূমিকার জন্য জামায়াতের গ্রহণযোগ্যতা সাধারণ জনগণের কাছে নেই। এই দলের প্রতিষ্ঠাতা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদীর লেখায় ইসলামী শরিয়তের বিভিন্ন বিষয়ে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, সেই ব্যাখ্যা এদেশের হক্কানি আলেমদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তারা একে বাতিল মতবাদ বলে মনে করেন। এ ছাড়াও দলের রেজিমেণ্টেড পরিবেশ ও দুর্বল নেতৃত্বের জন্য দীর্ঘ ৫০ বছর রাজনীতি করেও দলটি ক্ষমতাসীন হতে না পারার কারণে এর বিকল্প হিসেবে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

উদ্যোক্তারা ঢাকায় ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি বৈঠকও করেছেন। এক পর্যায়ে পুরানা পল্টনে অবস্থিত তাদের একটি টেলিভিশন কেন্দ্রের রুদ্ধদ্বার কক্ষে গোলটেবিল বৈঠকও করেন। এতে ‘কেন এবং কীভাবে’ জামায়াতের নাম পরিবর্তন করে নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠন করা যায়- তা নিয়ে একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করা হয়। এ নিয়ে জামায়াতের প্রথম কাতারের নেতৃত্বে মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়। এই উদ্যোগের সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের সতর্কও করে দেন দলটির শীর্ষ নেতৃত্ব। চলতি বছরের ৯ জুন ঢাকার একটি বেসরকারি ‘থিঙ্ক ট্যাঙ্ক’ ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচন পর্যালোচনা করে একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ দাঁড় করায়।

এতে তারা জামায়াত সম্পর্কে মন্তব্য করে এই বলে যে, ‘জামায়াত বর্তমানে ইমেজ সংকটে ভুগছে। ভবিষ্যতে এই অবস্থার আরো অবনতি ঘটতে পারে। এমতাবস্থায় জামায়াতের রাজনীতির প্রতি অনুগত সব ব্যক্তি ও শক্তিকে কৌশল হিসেবে একটি নয়া প্লাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে নতুন নামে রাজনৈতিক দল সৃষ্টির বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে।’ ওই থিঙ্ক ট্যাঙ্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান,

* ‘ইসলামিক মুভমেন্ট বাংলাদেশ ব্লগ’ সাইটে প্রকাশিত। লিংক- imbd.blog.com/?p=776
এই মিটিংয়ে উপস্থাপিত কী-নোট পেপারটি পরিশিষ্ট-১ এ সংযোজিত।

তাদের এই বিশ্লেষণ ইংরেজিতে অনুবাদ করে ঢাকার কূটনীতিক পাড়ায় বেশ কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রদূতের কাছেও উপস্থাপন করা হয়। এই বিশ্লেষণটি জামায়াতের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছেও দেওয়া হয়।

জামায়াত সাংগঠনিকভাবে এই বিশ্লেষণের প্রতি আগ্রহ দেখায়নি। তবে জামায়াতেরই একটি প্রভাবশালী অংশ “বাংলাদেশের রাজনীতির চালচিত্র” নামের এই থিসিসটি লুফে নেয়। জামায়াতের প্রভাবশালী নেতা মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মীর কাশেম আলী এ নিয়ে তার সমমনাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তিনি তাদের সমর্থন পেয়ে এ ব্যাপারে আরো একটি নতুন থিসিস তৈরির দায়িত্ব দেন জামায়াতে তারই অনুগত একটি গ্রুপকে। তারা একটি ব্যাপকভিত্তিক থিসিস তৈরি করে দেখালে মীর কাশেম আলী থিসিসকে ‘সামআপ’ করতে বলেন। পরে একটি গোলটেবিল বৈঠকে এই থিসিসটি পাওয়ার পয়েন্ট হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।

সূত্রটি জানায়, এই গোলটেবিল বৈঠকে মীর কাশেম আলী ছাড়াও জামায়াতের সিনিয়র সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক, সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নান এবং ছাত্রশিবিরের সাবেক বেশ কয়েকজন সভাপতি উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকের এই খবর জামায়াতের আমির মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী জানতে পেরে মীর কাশেম আলী ও মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের কাছে কৈফিয়ত তলব করেন বলে সূত্রটি নিশ্চিত করে।

মাওলানা নিজামী তাদের বলেন, কার অনুমতি নিয়ে এ ধরনের একটি কাজ করার উদ্যোগ নেওয়া হলো? নিজামী ছাত্রশিবিরের নেতাদের এই বলে বোঝান যে, মীর কাশেম আলী ও মুহাম্মদ কামারুজ্জামান সুযোগসন্ধানী। তাদের কথায় কান না দেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। নিজামীর এই কথার জবাব দেন ছাত্রশিবিরের ক’জন সাবেক সভাপতি। তারা নিজামীকে বলেন, তারা সুযোগ-সন্ধানী হলে তাদের জামায়াতের নেতৃত্বে রাখা হলো কেন? এর উত্তর আর নিজামী দিতে পারেননি বলে জানা যায়।

গোলটেবিল বৈঠকে যে পাওয়ার পয়েন্টটি উপস্থাপন করা হয়, তাতে মুসলিম দেশগুলোর রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বলা হয়, ‘সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কোনো মুসলিম দেশেই সংসদ নির্বাচনে ইসলামী দলগুলো সরকার গঠনের মতো প্রয়োজনীয়সংখ্যক আসন লাভ করতে পারেনি। বরং দেখা যায় তাদের প্রাপ্য ভোটের সংখ্যা ক্রমাগত কমে আসছে।’ ওই পাওয়ার পয়েন্টে বাংলাদেশের ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোর ভবিষ্যৎ নিয়ে উপস্থাপন করা বক্তব্যে বলা হয়, ‘বাংলাদেশের গত তিন-চার দশকের ইসলামী রাজনীতি প্রত্যাশিত সফল বয়ে আনতে পারেনি। সেকুলার আওয়ামী লীগ, জাতীয়তাবাদী বিএনপি ও সুবিধাবাদী জাতীয় পার্টি ঘুরে-ফিরে বিভিন্ন মেয়াদে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিল। ইসলামী দলগুলোর মধ্যে জামায়াতে

ইসলামী ছাড়া অন্য দলগুলোর সাংগঠনিক ও জনভিত্তি উল্লেখ করার মতো নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও জামায়াত নির্বাচনী দৌড়ে পিছিয়ে রয়েছে।

বাস্তবতা এমন দাঁড়িয়েছে, সততার সুনাম থাকা সত্ত্বেও বর্তমান নেতৃত্ব নিয়ে জামায়াতের পক্ষে ভবিষ্যতে এককভাবে সরকার গঠনের মতো জনপ্রিয়তা অর্জন করা আদৌ সম্ভব নয় বলে কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করেন। পাওয়ার পয়েন্টে জামায়াতে বেশ কয়েকটি সীমাবদ্ধতার কথা তুলে ধরা হয়। বলা হয়:

এক, একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করায় জামায়াতের প্রথম সারির বর্তমান নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিরূপ প্রচারণা থাকায় সর্বজনগ্রাহ্য জাতীয়ভিত্তিক ইমেজ তৈরি তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছে। প্রায় চার দশক জামায়াতের বিরুদ্ধে এই প্রচারণা বন্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে তা আবার শুরু হয়েছে। এতে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে জামায়াতের ব্যাপারে একটি বিরূপ প্রভাব পড়েছে। বর্তমানে যুদ্ধাপরাধী বিষয়টি সামনে চলে আসায় এটি আরো জটিল আকার ধারণ করেছে। এমতাবস্থায় জামায়াতের রাজনৈতিক ইমেজ পুনরুদ্ধার বা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত কঠিন হবে।

দুই, দলটির শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃত্বে রয়েছে দুর্বলতা। তাদের কেউ কেউ বৃদ্ধ ও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। নতুন উদ্যমে দলকে এগিয়ে নেওয়ার সামর্থ্য তাদের নেই।

তিন, জামায়াতের পরিবেশ রুদ্ধদ্বার (রেজিমেন্টেড) ধরনের। এ জন্য ইসলামী মূল্যবোধসম্পন্ন উদারনৈতিক ব্যক্তির এই দলে প্রবেশ করতে পারে না। দলটিতে সং মানুষের অভাব না হলেও দেশ পরিচালনায় নেতৃত্ব দেওয়ার মতো উপযুক্ত ও দক্ষ লোকের অভাব রয়েছে। জামায়াতের বাইরে যেসব সং ও দক্ষ লোক রয়েছে, তারা যে কোনো পর্যায়ে জামায়াতে যোগ দিতে উৎসাহবোধ করে না।

চার, জামায়াতের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচার-প্রচারণা বর্তমানে আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। এতে ভোটারের মধ্যে বিরূপ প্রভাব পড়েছে।

পাঁচ, রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে জামায়াতের বর্তমান নেতৃত্বের মধ্যে আধুনিক ধ্যান-ধারণার অভাব রয়েছে। সমস্যাসংকুল বাংলাদেশের বেশকিছু মৌলিক সমস্যা রয়েছে। সব দলই এসব বিষয়ে কোনো না কোনো বক্তব্য দিয়ে থাকে। এসব সমস্যার অগ্রাধিকার নির্ণয় করে জামায়াত উত্তম বিকল্প কোনো সমাধানের দিকনির্দেশনা জাতির সামনে পেশ করতে পারেনি। আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির অসং নেতৃত্বের বিকল্প হিসেবে জামায়াতের নেতারা তাদের দলকে জাতির সামনে তুলে ধরতে পারেননি।

৩০ | কামারুজ্জামানের চিঠি এবং জামায়াতের সংস্কার প্রসঙ্গ

ছয়, ভোটের রাজনীতিতে বর্তমানে যে কৌশল নেওয়া হয়, তা নিতে জামায়াতের বেশ সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

সাত, জামায়াত নতুন প্রজন্মের চিন্তা-চেতনার আলোকে নিজেদের উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে। নতুন প্রজন্মের ভোটারদের কাছে নিজেদের কর্মসূচি উপস্থাপনের জন্য যে ধরনের আধুনিক পরিভাষা ব্যবহার করা প্রয়োজন, তা ব্যবহারে জামায়াতের ব্যর্থতা রয়েছে।

আট, নীতি ও আদর্শের সঙ্গে আপস না করেও কৌশলগত কারণে উদারনীতি অনুসরণ করে সমর্থনের পরিধি বৃদ্ধির দৃষ্টিভঙ্গি জামায়াতের নেই।

নয়, বর্তমানে বিএনপির ভঙ্গুর অবস্থার কারণে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তির ঐক্য ভবিষ্যতে কতটা কার্যকর হবে তা বলা কঠিন।

এমনি এক পরিস্থিতিতে বিকল্প রাজনীতির সন্ধানের জন্য মত প্রকাশ করা হয় পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনায়। এতে বলা হয়, দীর্ঘ প্রায় ৫০ বছর জামায়াত বাংলাদেশের মাটিতে কাজ করে ব্যাপক সাংগঠনিক ভিত্তি অর্জন করলেও ভোটারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সমর্থন তৈরি করতে পারেনি। বিএনপিও এক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এ জন্য জনগণ আওয়ামী লীগের বিপরীতে বিএনপি ও জামায়াতের বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি দেখতে চায়। প্রস্তাবিত এই দলটি কেমন হবে তারও একটা চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে পাওয়ার পয়েন্টে। এতে বলা হয়, দলটি ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী বলে ঘোষণা দেবে। তবে 'ইসলামী রাষ্ট্র' বা 'শরিয়াহ আইন' চালু করার মতো হার্ড লাইন অনুসরণ করবে না। এটি কোনো রেজিমেণ্টেড বা ক্যাডারভিত্তিক দল হবে না। এই দলের নামকরণে কোনো ইসলামী শব্দ বা পরিভাষা ব্যবহার করা ঠিক হবে না। প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুসরণ করে তৃণমূল থেকে নতুন নেতৃত্ব বাছাই করতে হবে। এই দলকে পাশ্চাত্যের ধাঁচে অত্যন্ত সুশৃঙ্খল একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা যায়।

উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক অঙ্গন ছাড়াও বাংলাদেশেই নাম পরিবর্তন করে জামায়াতের অঙ্গ প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করছে। স্বাধীনতার পর ১৯৭৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ইসলামী ছাত্রসংঘ নাম পরিবর্তন করে ইসলামী ছাত্রশিবির নামে কাজ করে আসছে। জামায়াতও মাওলানা আবদুর রহীমের নেতৃত্বে ইসলামী ডেমোক্রেটিক লীগ নামে কাজ করেছে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত।

পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে নতুন কর্মকৌশল গ্রহণ সময়ের দাবী*

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

১. বাংলাদেশে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ইতিহাসের একটি কঠিনতম সংকটকাল অতিক্রম করছে। ১৯৭১ সালে একটি বড় ধরনের রাজনৈতিক বিপর্যয়ের পর মাত্র দুই দশকের মধ্যে ইসলামী আন্দোলন পুনর্গঠন ও পুনর্বিদ্যাসের মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। জামায়াতে ইসলামী নিষিদ্ধ ঘোষিত হবার মাত্র নয় বছরের মাথায় পুনরুজ্জীবিত হয়েছে বাংলাদেশে। পৃথিবীর অন্য কোথাও এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি। অর্ধ শতাব্দীর বেশিকাল যাবত মিসরের ইসলামী আন্দোলন আল-ইখওয়ানুল মুসলেমুন বা মুসলিম বাদারহুড এখনও পর্যন্ত নিষিদ্ধই রয়ে গিয়েছে। তুরস্কের ইসলামী আন্দোলন অনেকবার নাম পরিবর্তন করে অনেকটা সেক্যুলার আদলে কাজ করছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পরও বাস্তব কারণেই এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে কৌশলগত অবস্থান গ্রহণ করেছে।

২. এত অল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামী স্বনামে আবির্ভূত হয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম হওয়ার পিছনের মূল কৃতিত্ব ঐ সব তরুণদের যারা অকপটে ইসলামের জন্য জীবন দান করেছে এবং শাহাদাত বরণ করেছে। শতাধিক শাহাদাতের ঘটনা ইসলামী আন্দোলনকে আধ্যাত্মিক শক্তি যুগিয়েছে। জামায়াতে ইসলামী বর্তমান পর্যায়ে আসার জন্য দ্বিতীয় যে শক্তি তাহলো সারাদেশে জামায়াত ও শিবিরের নিবেদিতপ্রাণ সক্রিয় কর্মীগণ। শুধুমাত্র এবং শুধুমাত্র ইসলামের জন্যই তারা এই আন্দোলনের সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এতবড় মুখলেছ কর্মীবাহিনী পৃথিবীতে খুব কমই দেখা যায়। তৃতীয়ত, জনগণের মধ্যে একটি বিপুল অংশ যাদের সংখ্যা কম করে হলেও ১০-১৫% ভাগ হবে তারা ইসলামী আন্দোলনের প্রতি সমবেদনা পোষণ করেন।

* এই চিঠির লেখক বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী জেনারেল। এটি আইএমবিডি ব্লগে ২০১১ সালের আগস্ট মাসে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।
লিংক- imbd.blog.com/?p=278

৩. কিন্তু বর্তমানে জামায়াতে ইসলামী তথা বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলন যে সংকটের মুখোমুখি তা খুবই ব্যতিক্রমধর্মী। জামায়াতে ইসলামীকে দল হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী এবং উপরন্তু দলের বর্তমান নেতৃত্বকে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৯৭১ সালে বিশেষ এক পরিস্থিতিতে একটি ইসলামী দল হিসাবে বিশ্বের অন্যতম প্রধান একটি মুসলিম রাষ্ট্রকে খণ্ডিত করার বিপক্ষে তথা পাকিস্তান নামক দেশটিকে এক রাখার পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল জামায়াত। তখনকার জামায়াত মনে করতো পাকিস্তান এক রেখে এখানে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে পূর্ব ও পশ্চিমের অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চনার অবসান হবে। জামায়াতের আরও আশঙ্কা ছিল পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ আলাদা হলে এখানে ভারতীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু জামায়াতের এবং আরো যারা পাকিস্তানকে এক রাখার পক্ষে ছিলো তাদের ইচ্ছার বিপরীতে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রতিবেশী দেশ ভারতের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। পাকিস্তানের ৯৫ হাজার সৈন্য ভারতের ইস্টার্ন কমান্ডের সেনাপতি জগজিত শিং অরোরার নিকট নতুন স্বাধীন দেশ বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ করে। জামায়াত যদিও বা পাকিস্তানের সংহতির পক্ষে ছিল তথাপি বাংলাদেশের স্বাধীনতা মেনে নেয়। বাংলাদেশের সরকার জামায়াতসহ ধর্মভিত্তিক দলসমূহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৭৯ সালের ২৫শে মে জামায়াত নিজস্ব নামে আত্মপ্রকাশের সুযোগ লাভ করে।

৪. ১৯৪৭ সালে বৃটিশ দখলদারিত্বের অবসানের সময় উপমহাদেশে রাজনৈতিক বিতর্ক ছিল। অনেকেই ভারত বিভাগের বিপক্ষে ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভারত ও পাকিস্তান দুটি আলাদা রাষ্ট্র গঠিত হয় ভারতকে খণ্ডিত করে। যারা পাকিস্তান চেয়েছিলেন তাদের অনেকেই ভারতেই থেকে যান। কেউ তাদের স্বাধীনতা বিরোধী আখ্যায়িত করেনি। যে মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করে সেই মুসলিম লীগ দেশ ভাগ হবার পর এক অংশ ভারতেই থেকে যায় এবং অদ্যাবধি ভারতে মুসলিম লীগ রয়েছে। তাদেরকে স্বাধীনতা বিরোধী বলা হয় না। কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাপারে স্বাধীনতার পক্ষ ও বিপক্ষ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ ও বিপক্ষকে নিয়ে এমনভাবে প্রচারণা চালানো হয় যার ফলে গোটা জাতিকেই বিভক্ত করে ফেলা হয়। রাজনৈতিক প্রজ্ঞার দাবী ছিল ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর সবাইকে সাথে নিয়ে দুর্ভেদ্য জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা। কিন্তু যে শক্তি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের তদানীন্তন নেতৃত্বকে আলোচনার টেবিলে বসে রাজনৈতিক মীমাংসার পথ অনুসরণ করতে দেয়নি সেই শক্তিই বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার পরিবর্তে অনৈক্য, বিভেদ এবং প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার পথে দেশকে ঠেলে দেয়। বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে বিভাজন ও বিভক্তি জিইয়ে রাখাটা হচ্ছে একটি আধিপত্যবাদী কৌশল। বাংলাদেশে যাতে স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা সৃষ্টি না হয় তার জন্যই জাতিকে বিভক্ত করে রাখার এই কৌশল গ্রহণ করা হয়।

বাংলাদেশ যদি রাজনৈতিক হানাহানি মুক্ত হয় তাহলে দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও স্বনির্ভরতা অর্জন করবে। বাংলাদেশের বিশাল বাজার যারা দখলে রাখতে চায় তারা কিন্তু এটা চায় না যে রাজনৈতিকভাবে স্থিতিশীল ঐক্যবদ্ধ এবং অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হোক বাংলাদেশ। সত্যিকথা বলতে কি আধিপত্যবাদী শক্তি এ ব্যাপারে শতকরা একশত ভাগ সাফল্য অর্জন করেছে।

আজ বাংলাদেশকে রাজনৈতিকভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেলা হয়েছে। বাংলাদেশে আজ কল্পিত স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি আবিষ্কার করে দেশকে স্বাধীনতার পক্ষ ও বিপক্ষ দুইভাগে বিভাজন করে রাজনৈতিক প্রচারণা চালানো হচ্ছে এবং নতুন প্রজন্মকে সেভাবেই বোঝানো হচ্ছে। অথচ ভারতে তো দেশ বিভাগের বিরোধী এবং দেশবিভাগের পক্ষের শক্তি বলে কিছু নেই। বরং তারা জাতীয় ইস্যুতে নিজেরা ঠিকই ঐক্যবদ্ধ রয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপি এবং কংগ্রেস নেতারা জাতীয় দিবসে একসাথে বসছে, মহাত্মা গান্ধীর প্রতি এলকে আদভানী ও কংগ্রেসের নেতারা হাত ধরাধরি করে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছে। অথচ আদভানীদের দলই গান্ধীকে হত্যা করে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই। তারা তাদের জাতীয় স্বার্থে জাতীয় ঐক্য রক্ষা করছেন যথারীতি। কিন্তু বাংলাদেশে ১৯৭১ কে কেন্দ্র করে যে মতদ্বৈততা ছিল বা পক্ষ-বিপক্ষ ছিল তা জিইয়ে রাখার জন্য সর্বাধিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ভারতপন্থী এবং ভারতবান্ধব লোকেরা। সারা ভারতের মুসলমানদের সংগ্রামের ফসল পাকিস্তানের ব্যাপারে ইসলামী দলগুলোর একটা দুর্বলতা ছিল এটা অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর সকল ইসলামী দল ও ব্যক্তিবর্গ বাংলাদেশের স্বাধীনতা মেনে নিয়ে গঠনমূলক কাজ করছে। আর তাছাড়া ১৯৪৭ সালে যদি পাকিস্তান না হতো তাহলে তো আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ হতো না। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম না হলে আজকের বাংলাদেশ হয়তো বা একটি প্রদেশের অংশ হতো। ঢাকা ও স্বাধীন রাষ্ট্রের রাজধানীর মর্যাদা পেতো না।

৫. জামায়াতে ইসলামীর জন্য সংকটটি সৃষ্টি হয়েছে এই জায়গায় যে, ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশে সম্পূর্ণ নতুনভাবে একটি দল হিসাবে আত্মপ্রকাশের পরও আধিপত্যবাদী শক্তি এবং ইসলামের দূশমন অধার্মিক ও ধর্মহীন শক্তি এই সংগঠনকে বাংলাদেশ বিরোধী, স্বাধীনতা বিরোধী এবং মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী বলে চিত্রায়িত করে দেশের জনগণের এক বিপুল অংশের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। স্কুলের পাঠ্যপুস্তকেও জামায়াতকে স্বাধীনতা বিরোধী দল হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। সাহিত্য, নাটক, উপন্যাস, গল্প, কবিতা, সিনেমা, টিভি চ্যানেল, পত্র-পত্রিকায় অব্যাহতভাবে অনেকটা একতরফা জামায়াত বিরোধী প্রচারণা চলে এবং জামায়াতের নেতৃবৃন্দের চরিত্রহনন করা হয়। স্বাধীনতা বিরোধিতার অভিযোগ বা যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ খুবই গুরুতর এবং স্পর্শকাতর অভিযোগ। বাংলাদেশে জামায়াত অত্যন্ত সততার সাথে সৎ ও যোগ্য লোকদের সমন্বয়ে নিয়মতান্ত্রিক ও গঠনমুখী কার্যক্রম আন্তরিকতার সাথে

পরিচালনা সত্ত্বেও জামায়াতকে স্বাধীনতা বিরোধী হিসাবে চিত্রিত করার ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ শক্তি পুরোপুরি সফলকাম হয়েছে। সাধারণ জনগণের নিকট বিষয়টির খুব একটা আবেদন না থাকলেও কিংবা জনগণ এসব নিয়ে না ভাবলেও সমাজের রাজনীতি সচেতন এবং এলিট শ্রেণী যারা আসলেই দেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে সক্রিয় রাজনীতি চর্চা করেন তাদের একটি বিপুল অংশই জামায়াতের ব্যাপারে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করেন।

৬. দেশপ্রেমিক এবং সমাজের তুলনামূলকভাবে সৎ মানুষদের এই দলটির দুর্ভাগ্য বিশেষ করে বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি রং সাইডে পড়ে গিয়েছে। মিসরের ইখওয়ানের এই সমস্যা নেই বরং মিসরের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে দলটি অংশগ্রহণ করেছে। তুরস্কের ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। ইয়েমেনে সেখানকার ইসলামী আন্দোলন দুই ইয়েমেনকে একত্রিত করে আধুনিক গণতান্ত্রিক ইয়েমেন প্রতিষ্ঠায় সরাসরি অবদান রেখেছেন। নাইজেরিয়া, আলজেরিয়া ও সুদানে সেখানকার ইসলামী আন্দোলনসমূহ স্বাধীনতা অর্জনে ইতিবাচক অবদান রেখেছেন। ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় ইসলামী আন্দোলন স্বাধীনতা সংগ্রামে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। পৃথিবীর সর্বত্রই ইসলাম স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। ইসলামের নামে অর্জিত পাকিস্তানের এটা একটা ট্রাজিডি যে দেশটি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে ইসলামের দোহাই দিয়ে ইসলামকেই কলংকিত করেছে এবং আন্তরিকভাবে যারা দেশটার সংহতি রক্ষার পক্ষ অবলম্বন করেছে তারাও নিজেদের গায়ে কলংক লেপন করেছে। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বর্তমান নেতৃত্ব যারা দিচ্ছেন তারা ১৯৭১ সালে জামায়াতের নেতৃত্বে ছিলেন না এবং অধিকাংশই জামায়াতের সদস্যও ছিলেন না তথাপি তারা স্বাধীনতা বিরোধিতার অভিযোগে অভিযুক্ত এবং তাদেরকেই যুদ্ধাপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে।

৭. একথা ঠিক যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টি একটি মীমাংসিত ইস্যু। মরহুম শেখ মুজিব নিজেই বিষয়টি নিষ্পত্তি করে গিয়েছেন। পাকিস্তানের ১৯৫ জন সামরিক কর্মকর্তার বিচারের জন্য ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল এ্যাক্ট পাস করা হলেও ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারত এই ত্রিদেশীয় চুক্তির মাধ্যমে ১৯৫ জন চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীকে ক্ষমা করে পাকিস্তান পাঠিয়ে দেয়া হয়। এর আগে দালাল আইনে স্থানীয় সহযোগীদের যে বিচার হচ্ছিল বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে স্বয়ং শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালের নভেম্বরে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। এতে আটক সাতত্রিশ হাজারের মধ্যে পঁচিশ হাজার যাদের নামে হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল না তাদের মুক্তি দেয়া হয়। ২৮০০ এর বিচার হয় এবং এতে ৭৫২ জনের বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি হয়। আটক অন্যান্যদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ না থাকায় যখন মামলা চলছিল না, এরকম একটি পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট বিচারপতি

সায়ম ১৯৭৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর কথিত দালাল আইনটি বাতিল করেন। ফলে দালাল আইনে আটক ও সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ আইনী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু এরপর ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় আসার পর আওয়ামী লীগ যুদ্ধাপরাধ ইস্যু সামনে আনেনি। ৩৯ বছর পর কেন এবার যুদ্ধাপরাধের মত একটি মীমাংসিত এবং স্পর্শকাতর ইস্যু এতটা গুরুত্বের সাথে সামনে আনা হলো? বিষয়টি খুবই পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশে জনগণের মধ্যে প্রতিহিংসা জাগিয়ে তোলার জন্য এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্যই সামনে আনা হয়।

৮. ২০০১ সালের নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তির ঐক্যের ফলে চারদলীয় জোটের বিজয় বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক তাৎপর্যময় ঘটনা। এই ঐক্য যদি অব্যাহত থাকে এবং আরো সম্প্রসারিত হয় তাহলে ভারতবান্ধব ধর্মহীন বা অধার্মিক সরকার ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ হয়ে যায়। ভারতীয় লবী এই বিষয়ে এখানে নানা কৌশল গ্রহণ করে। একদিকে তারা জামায়াতকে বলে যে, “আপনাদের মত একটি সংলোকের দল বিএনপির মত একটি দুর্নীতবাজদের দলের সাথে জোট গঠন করে আপনাদের ভবিষ্যৎ কেন ধ্বংস করছেন। আপনাদের উচিত বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোট থেকে বের হয়ে আসা।” অন্যদিকে তারা বিএনপিকে বলতে থাকে ‘আপনারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী একটি দল’ আপনাদের দলে আছেন অনেক বীর মুক্তিযোদ্ধা। স্বাধীনতা বিরোধী জামায়াতকে সাথে নিয়ে আপনারা কেন বদনামের ভাগী হচ্ছেন। যুদ্ধাপরাধীদের পুনর্বাসিত করে আপনারা জনসমর্থন হারাচ্ছেন। তাদের এই প্রচারণার ফলে চারদলীয় জোটের ঐক্যের সমস্যা না হলেও বিএনপির কিছু কিছু মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে। বিশেষ করে ছাত্র সংগঠন পর্যায়ে কিন্তু বিএনপি-জামায়াত ঐক্যের মত ঐক্য গড়ে উঠে নাই। ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে ঐক্য যতটা সুদৃঢ় হওয়া উচিত ছিল তার অভাব ছিল। যেহেতু জামায়াত ও বিএনপির ঐক্য সুদৃঢ় হলে রাজনীতিতে বিএনপি হবে বিনিফিশিয়ারী এবং ক্ষমতার লড়াইটা বর্তমানে যেহেতু বিএনপির সাথে তাই একান্তরের ইস্যুতে জামায়াতকে ঘায়েল করা সম্ভব হলে তা কার্যত বিএনপিকে কোণঠাসা করতেই সহায়ক হবে।

৯. ১৯৯১ সালে জামায়াতের সমর্থনে বিএনপি সরকার গঠনের পরও আওয়ামী লীগ খুবই রাজনৈতিক পরিপক্বতার সাথে এক পর্যায়ে জামায়াতের সাথে রাজনৈতিক সখ্যতা গড়ে তোলে। জামায়াতের সমর্থনে সরকার গঠনের পরও বিএনপি জামায়াতকে সাথে ধরে না রেখে আওয়ামী লীগের দিকেই ঠেলে দেয়। আওয়ামী লীগ অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে জামায়াত ও জাতীয় পার্টিকে সাথে নিয়ে যুগপৎ আন্দোলন গড়ে তুলে এবং রাজনৈতিকভাবে বিএনপিকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ফলে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তির মধ্যে কোনো ধরনের সমঝোতা হতে পারেনি।

জামায়াত ৩০০ আসনেই নির্বাচন করে। নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় খুবই অল্প ভোটের ব্যবধানে বিএনপি ও জামায়াত ৫৮টি আসনে পরাজিত হয়। যদি কোন সমঝোতা হতো এবং বিএনপি ও জামায়াতের ভোট ভাগাভাগি না হতো তাহলে কোনক্রমেই আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের পর সরকার গঠন করতে পারতো না। ২০০১-এর নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াত জোট হবার ফলে আওয়ামী লীগের নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় ফিরে আসার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। আর এ কারণেই আওয়ামী থিংকট্যাঙ্ক এবং তাদের শুভাকাঙ্ক্ষীরা রাজনৈতিক বিবেচনায় যুদ্ধাপরাধী ইস্যু সামনে নিয়ে আসে।

১০. মিডিয়া যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ইস্যুটিকে এতটাই সামনে এনেছে যে, আওয়ামী লীগের পক্ষে এই ইস্যুকে পিছে ঠেলে দেয়ারও কোনো উপায় নেই। প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ হাসিনা বলেই ফেলেছিলেন যে, বিচার তো জনগণই করে দিয়েছে নির্বাচনের মাধ্যমে। কিন্তু ভারতীয় লবি, বামপন্থী ধর্মহীন গোষ্ঠী এবং তাদের সমর্থক মিডিয়া যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ইস্যুটিকে এমনভাবে হাইলাইট করেছে যে, সরকার এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছে। মেনিফেস্টোতে এটা ছিল। জাতীয় সংসদে সিদ্ধান্ত প্রস্তাব হিসাবে সরকারের শীর্ষ মহলের অনাগ্রহ সত্ত্বেও সংসদে প্রস্তাব পাস করা এবং ভারতীয় অর্থে লালিত বিভিন্ন সংস্থার প্রচারণার ফলে শেষ পর্যন্ত ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল আইনটি সংশোধন করা, ট্রাইব্যুনালের বিচারক, তদন্ত টিম, প্রসিকিউটর ইত্যাদি নিয়োগ দান এবং সরকারের মন্ত্রীদের বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমে এই ইস্যুটিকে এমন এক পর্যায়ে আনা হয়েছে যাতে যে কোনভাবেই হোক যুদ্ধাপরাধের বিচার করা সরকারের জন্য এক অপরিহার্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

১১. জামায়াতের বর্তমান নেতারা ১৯৭১ সালে ২/৪ জন ছাড়া কেউই জামায়াতের সদস্য ছিলেন না, তারা সশস্ত্রবাহিনীতে ছিলেন না, সরকারের কোনো পর্যায়েরও দায়িত্বশীল লোক ছিলেন না, বা অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধেও অংশ নেননি। এসব বিষয় আওয়ামী লীগ নেতারাও জানেন। কিন্তু রাজনীতি এমনি এক জিনিস যাতে ক্ষমতার স্বার্থে অনেক কিছুই করতে হয়। জামায়াতের নেতৃবৃন্দকে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে প্রচারণা চালিয়ে মিডিয়া ট্রায়াল ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। মিথ্যা প্রতিবেদন ছেপে তাদের বিরুদ্ধে গণহত্যা, খুন, ধর্ষণ, লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগের মিথ্যা মামলা সাজানো হচ্ছে। বিভিন্ন মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করার পর আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল বেআইনীভাবে জামায়াতের পাঁচজন শীর্ষ নেতাকে আটক রাখার কথা ঘোষণা করেছে। মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করার পর ৭৩-এর তথাকথিত আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল এক্টের বিধি নতুন করে সংশোধন করেছে। ১৯৭০-এর এই তথাকথিত আইনটি একটি কালো আইন। এই আইনে সাক্ষ্য প্রমাণের কোন প্রয়োজন নেই। বিবাদীর মৌলিক অধিকার এই আইনে সংরক্ষণ করা হয়নি। সংবিধানের মৌলিক অধিকার খর্ব করে আইনটি

এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে (সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর মাধ্যমে) সরকার যে কোন লোককে গ্রেফতার করে বিচারের নামে প্রহসন করে শাস্তি দিয়ে দিতে পারে।

১২. ইতোমধ্যেই সরকার দলীয় লোকদেরকে ট্রাইব্যুনালের বিচারক, প্রসিকিউটর এবং তদন্তকারী সংস্থার সদস্য হিসাবে নিয়োগ দিয়েছে। এসব লোক ইতোমধ্যেই জামায়াতের গ্রেফতারকৃত কয়েক নেতার জেলা এবং নির্বাচনী এলাকা ঘুরে এসে মিডিয়ায় মিথ্যা বিবৃতি দিয়ে বলেছে যে জামায়াত নেতাদের বিরুদ্ধে অনেক হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী পাওয়া গিয়েছে। এই ট্রাইব্যুনাল গঠনই করা হয়েছে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য। তাছাড়া সরকার যে সব নির্বাচনী অঙ্গিকার করেছিল তার কোনোটাই পূরণ করতে পারেনি। সন্ত্রাস-হত্যা, ধর্ষণ অপরাধ ও দুর্নীতি মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে। সরকার দলীয়দের চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, দখলবাজি, চাকরি বাণিজ্য, ভর্তি বাণিজ্য, দুর্নীতি অতীতের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে গিয়েছে। চাল, ডাল, তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য নাগামহীনভাবে বেড়ে চলছে। ক্ষমতাসীনদের প্রশ্রয় ও ছত্রছায়ায় ইভটিজিং সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। সরকারী দল নিজেরাই খুনাখুনি করছে এবং ক্ষমতার দাপটে বিরোধী দলকে অনেক জায়গায় হামলা করছে এবং বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের হত্যা করছে। সরকার সমর্থক সন্ত্রাসীদের মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করে মুক্তি দিয়ে দিচ্ছে। রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলা আখ্যায়িত করে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা ১০ হাজারের অধিক মামলা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। দেশের জন্য কিছু করতে না পারলেও ট্রানজিট, বন্দরসহ প্রতিবেশী দেশকে সকল সুযোগ-সুবিধা দান করার ব্যবস্থা করেছে এবং জাতীয় স্বার্থ বিরোধী চুক্তি সম্পাদন করেছে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য। এমতাবস্থায় জনগণের দৃষ্টিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য এবং দেশে যাতে কার্যকর আন্দোলন গড়ে উঠতে না পারে সে জন্য জামায়াতকে নেতৃত্বশূন্য করার জন্য তথাকথিত যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রহসন করছে। ফলে জামায়াত একটা কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি।

১৩. এই পরিস্থিতিতে কী হতে পারে? জামায়াতের করণীয় কী?

এক. সরকারের আরো তিনবছর সময় আছে। এই সময়ের মধ্যেই যে কোনোভাবে প্রহসনের বিচার করে জামায়াতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের শাস্তি দিতে পারে। জামায়াতের কর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের ঘাবড়ে দেয়ার জন্য মৃত্যুদণ্ডও দিতে পারে এবং অনেককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিতে পারে। আবার সম্ভাবনাময় জামায়াত নেতাদের নির্বাচনে দাঁড়ানোর অযোগ্য ঘোষণা করতে পারে এবং এমনকি তাদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারে। আদালতের রায়ের অযুহাতে জামায়াতকে নিষিদ্ধ করতে পারে অথবা রেজিস্ট্রেশন বাতিল করতে পারে।

দুই. বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত করে পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। জামায়াত নেতাদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে তাদের ভাবমর্যাদা খতম করে নির্বাচনী রাজনীতিতে জামায়াতকে একটি অকার্যকর দলে পরিণত করতে পারে।

তিন. একটা পর্যায়ে গিয়ে আন্তর্জাতিক চাপের কথা বলে এবং বঙ্গবন্ধু যেহেতু ক্ষমা করেছিলেন আওয়ামী লীগ ক্ষমা করতে জানে বলে ঘোষণা দিয়ে ক্ষমা করে জাতীয় ঐক্যের ডাক দিতে পারে।

চার. জামায়াতকে বিএনপি জোট ত্যাগ করার জন্য চাপ দিতে পারে এবং এর বিনিময়ে বিচারের বিষয়টি শিথিল করার প্রস্তাব দিতে পারে।

মোদাকথা হলো বিষয়টি যেভাবেই উপসংহার টানা হোক না কেন তাতে জামায়াত রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই। যদি সরকারের বর্তমান ঘোষণা অনুযায়ী বিচারকার্য চলে তাহলে জামায়াত যুদ্ধাপরাধীদের দল হিসাবে দেশেবিদেশে চিহ্নিত হয়ে যাবে। মিডিয়া ইতোমধ্যেই জামায়াতকে যুদ্ধাপরাধীদের দল বানিয়ে ফেলেছে। বিচার না করে সরকার যদি মুক্তিদান করেও দেয় তারপরও স্বাধীনতা বিরোধী এবং যুদ্ধাপরাধী হিসাবে যে কালিমা লেপন করে দেয়া হয়েছে ইতোমধ্যেই, সে কারণে দেশের জনগণ কি স্বাচ্ছন্দে জামায়াতের প্রতি আস্থা আনবে? কিংবা বিশাল ধর্মহীন শক্তি তারা জামায়াতকে মেনে নিবে বা জামায়াত রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করুক অথবা রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে আসুক এটা কি তারা চাইবে? নতুন প্রজন্মের সামনে জামায়াতকে যেভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে তাতে জামায়াত কি বৃহত্তর জনতার আস্থা অর্জন করতে পারবে?

১৪. পরিস্থিতি যাই হোক বর্তমান সরকার ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় জামায়াতের গ্রেফতারকৃত নেতৃবৃন্দ মুক্তি পাবেন না এটা মোটামুটি নিশ্চিত। সামনেও নির্বাচনে যে সরকার পরিবর্তন হবেই এমনটি নিশ্চিত করে বলা যায় না। যদি সরকার পরিবর্তন হয় তবুও নতুন সরকার জামায়াতের সাথে কী আচরণ করবে তা নিশ্চিত নয়। বর্তমান সরকার তো জামায়াতকে প্রচণ্ড চাপের মধ্যে রেখেছে। জামায়াতকে স্বস্তির সাথে কোন কর্মসূচী পালন করতে দিচ্ছে না। রাজপথে নামতে দিচ্ছে না। ছাত্রশিবিরকে নির্বিঘে কাজ করতে দিচ্ছে না। কয়েকশত জামায়াত-শিবির নেতাকর্মী এখনও কারাগারে। জামায়াত বা শিবির কোথাও ঘরোয়া বৈঠক করলেও পুলিশ সেই বৈঠককে গোপন বৈঠক আখ্যা দিয়ে গ্রেফতার অব্যাহত রেখেছে।

ইসলামী বইপুস্তককে জিহাদী ও জঙ্গি বই বলে পত্রপত্রিকায় খবর দিচ্ছে। জেএমবি, হারকাতুল জেহাদ ও লস্করে তৈয়েবার সাথে জামায়াতের সম্পর্ক এবং জামায়াত দেশব্যাপী সন্ত্রাসী তৎপরতা চালানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত— এমনসব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন খবর অহরহ প্রচার করছে মিডিয়ার একটি অংশ। সরকারের মন্ত্রীরাও জামায়াতের বিরুদ্ধে

সন্ত্রাসী তৎপরতায় মিথ্যা ও উদ্দেশ্যমূলক বিবৃতি প্রদান করছে এবং বিটিভিসহ সংবাদপত্রেও তা ব্যাপকভাবে প্রচার করছে। প্রকাশ্যেই জামায়াতকে নির্মূল ও খতম করার হুঁকার দেয়া হচ্ছে। সরকার ও তার মিত্ররা বাস্তবেই জামায়াতকে খতম করতে চায়।

১৫. এই উদ্ভূত পরিস্থিতিতে জামায়াতের সামনে কী পথ বা কৌশল থাকতে পারে তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনার প্রয়োজন আছে।

এক. একটি কর্মপন্থা এই হতে পারে যে, দেখি শেষ পর্যন্ত কী হয় বা জামায়াতের ভাগ্যে কী ঘটে। যে অবস্থায় ছিলাম সে অবস্থাতেই অপেক্ষা করতে থাকি। যদি জামায়াতের নামে কাজ করা সরকার বন্ধ করে দেয় তাহলে তখন দেখা যাবে কী করা যায়। সরকার বন্ধ করে দেয়ার আগে নিজেরা বন্ধ করা ঠিক নয়।

দুই. যেহেতু রাজনৈতিকভাবে রাষ্ট্রীয় শক্তি জামায়াতকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে, যেহেতু জামায়াতকে স্বাধীনতা বিরোধী এবং যুদ্ধাপরাধীদের দল হিসাবে চিহ্নিত করে দলটিকে প্রশ্রয়িত করে, যেহেতু একশ্রেণীর লোকের মধ্যে জামায়াত সম্পর্কে রিজার্ভেশন আছে, ভুল ধারণা আছে, নেতিবাচক ধারণা আছে, যেহেতু বর্তমান জামায়াতের নেতৃবৃন্দ দলের লোকদের নিকট জনপ্রিয় ও নির্দোষ হলেও তাদের ভাবমর্যাদাকে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে এবং যেহেতু এক ধরনের লোকের মাঝে জামায়াত নামটার প্রতিই এলার্জি আছে এবং পক্ষান্তরে জামায়াতের প্রতি আস্থা রাখে এবং জামায়াতের সততা ও আন্তরিকতার কারণে জামায়াতকে ভালোবাসে এমন একটি জনগোষ্ঠীও দেশে আছে যাদের সংখ্যা নেহায়েত কম নয়— এইসব সামগ্রিক বিবেচনায় রেখে জামায়াতের আন্দোলনের কৌশল পরিবর্তন করা সময়ের দাবী।

জামায়াত যেভাবেই আছে থাকুক তবে একটি নতুন রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা এবং ধর্মহীনতার যে সয়লাব আসছে তার বিরুদ্ধে সফল প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং ব্যাপকভিত্তিক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। জামায়াতের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে পিছনে থেকে একটি সংগঠন গড়ে তোলা। অন্যথায় জামায়াতের লোকদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

তৃতীয় বিকল্প হচ্ছে—

জামায়াতের যেসব নেতৃবৃন্দকে ১৯৭১ সালের সাথে সম্পৃক্ত করে মিথ্যা প্রচারণা চালানো হচ্ছে জামায়াতের নেতৃত্ব থেকে তাদের সকলেরই সরে দাঁড়ানো এবং সম্পূর্ণ নিউ জেনারেশন নিয়ে জামায়াত গঠন করা। নতুন নেতৃত্বের হাতে জামায়াতকে তুলে দেয়া এবং যেহেতু ১৯৭১ সালের ভূমিকার কারণে অন্যায়ভাবে জামায়াতের উপর জুলুম করা হচ্ছে তাই এদেশে ইসলামী আন্দোলনের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখা এবং গতিশীল করার স্বার্থে বর্তমান নেতৃত্ব যদি সরে দাঁড়ান তাহলে ইসলামের দুশমনদের

বলার কী থাকবে? তবে ইসলামের জন্য যারাই কাজ করবে তাদের বিরুদ্ধে অধার্মিক ও ধর্মহীন শক্তির অভিযোগের কোন অভাব হবে না।

১৬. এখানে উল্লেখ্য যে, ইসলামী ছাত্রশিবির নতুন সংগঠন হবার কারণেই এতদূর অগ্রসর হতে পেরেছে। পুরনো কোন সংগঠন হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কাজ করারই সুযোগ পেতো না। ছাত্রশিবির যেহেতু ইসলামী আন্দোলনের প্রধান রিক্রুটিং সেন্টার তাই শিবিরকেও বিতর্কিত করেছে ধর্মহীন শক্তি। শিবিরের অগ্রযাত্রায় আধিপত্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী বেশী আতঙ্কিত। শিবিরের নামেও চলছে লাগামহীন মিথ্যাচার। ছাত্রদের মধ্যে আর যেসব সংগঠন আছে তাদের হাতে কোনো আদর্শ নেই। ক্ষমতাসীন বা ক্ষমতায় যেতে আগ্রহী দলের ও ব্যক্তিবিশেষের লেজুড়বৃত্তি ছাড়া ওসব ছাত্র সংগঠনের জাতিকে দেবার মত কিছু নেই। চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, দখল বাণিজ্য, ভর্তি বাণিজ্য, সিট বাণিজ্য ওসব সংগঠনের জীবনীশক্তি। উন্মত্ত ব্যক্তিপূজার যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি চলছে তা থেকে দেশকে উদ্ধার করতে হলে আদর্শিক রাজনীতির কোনো বিকল্প নেই।

রাজনৈতিক বিকল্প সন্ধানের পাশাপাশি ছাত্র অংগনেও পরিবর্তনের চিন্তা করতে হবে। ছাত্রদের রাজনীতিমুখী সভা ও রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি থেকে বের করে আনতে হবে। জ্ঞান চর্চা, মেধার বিকাশ, খেলাধুলা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, উন্নত নৈতিকতা ও চরিত্র গঠনের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। লেজুরবৃত্তির রাজনীতি, নেশা ও মাদককে ‘নো’ বলতে হবে।

১৭. জামায়াতের সামনে যে তিনটি বিকল্পের কথা আমি উল্লেখ করেছি আমার মতে প্রজ্ঞার পরিচয় হবে যদি দ্বিতীয় বিকল্পটি গ্রহণ করা হয়। জামায়াত যেহেতু ৬০ বছরের অধিককাল থেকে এদেশে কাজ করেছে এবং দেশের কমপক্ষে ১০% জনগণের একটি সমর্থন জামায়াতের প্রতি আছে তাই এমন কিছু করা ঠিক হবে না যাতে জামায়াতের অবমূল্যায়ন করা হয়। কারণ বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতির যে একটা অবস্থান সৃষ্টি হয়েছে তা জামায়াতের আন্দোলনেরই ফসল। জামায়াতের সাথে অনেক মানুষের একটা আবেগের সম্পর্ক রয়েছে এবং জামায়াতের প্রবীণ নেতাকর্মীরাই জামায়াতকে এই পর্যায়ে আনার ব্যাপারে একটা অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাদের আন্তরিকতা এবং সততার ফলেই জামায়াত বাংলাদেশের সবচাইতে বড় ইসলামী দলের মর্যাদা লাভ করেছে। জামায়াত যদি একটি রাজনৈতিক প্লাটফর্ম করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তার পিছনে সর্বাত্মক শক্তি নিয়োজিত করে এবং সেই সাথে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে যত্নবান হয় তাহলে সেই প্লাটফর্মকে রাজনৈতিকভাবে সরাসরি আক্রমণ করতে পারবে না কেউ।

১৮. জামায়াতের যত বদনামই ধর্মহীন শক্তি করুক না কেন জামায়াতকে অগ্রাহ্য করে কোন কিছু করা সঠিক হবে না। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কৌশল অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত

জামায়াতকেই নিতে হবে। চিন্তার বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে দেয়া যাবে না। ১৯৪১ সালে পাকিস্তান আন্দোলন যখন বলতে গেলে তুঙ্গে উঠেছে, লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে গোটা ভারতবর্ষের মুসলমানরা একটি স্বাধীন আবাসভূমির দাবীতে একব্যবন্ধ ও সোচ্চার সেই সময় নতুন একটি দল জামায়াত প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগের আগে কয়েকটি আঞ্চলিক সম্মেলনের মাধ্যমে বিভক্ত ভারতে জামায়াতের কর্মপন্থা কি হবে সে ব্যাপারে পূর্বাঙ্কেই ইঙ্গিত প্রদান করা হয়। জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা নিজে কিছুসংখ্যক সদস্যসহ পাকিস্তান চলে আসলেও জামায়াতের একটি বড় অংশ ভারতেই থেকে যান। তারা সেখানে এক ধরনের কর্মসূচী নিয়ে কাজ করে যান। কিন্তু পাকিস্তানে জামায়াত তার কর্মসূচীতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। জামায়াত রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। অর্থাৎ জামায়াতের কর্মপন্থায় বিরাট পরিবর্তন আনা হয়।

এক সময় জামায়াত আইনজীবীদেরকে সদস্য করতো না। কিন্তু কৌশল বদলানো হয় এবং বাস্তবতার দাবী মেনে নিয়েই আইনজীবীদের দলের সদস্য করা হয়। প্রচলিত নির্বাচনে জামায়াত অংশ নিতো না এমনকি ভোটও দিত না। ভারতীয় জামায়াত এখনও নির্বাচনে অংশ নেয় না। শুধুমাত্র ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক জরুরী অবস্থা জারী জাতীয় প্রেক্ষিতে জামায়াতের সদস্যদের ভোট দেয়ার অনুমতি দান করা হয়েছিল। কাশ্মীর জামায়াত হিন্দুস্থান জামায়াত থেকে আলাদা অর্থাৎ স্বাধীন জামায়াত হওয়ায় তারা নির্বাচনে অংশ নিয়ে থাকে। এক সময় জামায়াত তার রুকন ছাড়া কাউকে নির্বাচনে মনোনয়ন দিত না। এখন এই নীতির পরিবর্তন করা হয়েছে। রুকন ছাড়াও মনোনয়ন দেয়া হয় এখন। মহিলাদেরকে সংসদে পাঠানোর সিদ্ধান্তও নিয়েছে। এমনকি নির্বাচনে মহিলাদেরও মনোনয়ন দান করেছে। বিগত উপজেলা নির্বাচনে ২৪ জন মহিলা প্রার্থী ছিল জামায়াতের, এর মধ্যে ১২ জন নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন। জামায়াত নির্বাচনী প্রচারণা সাথে প্রার্থীর ছবি ব্যবহার করতো না। এখন ছবি ব্যবহার করেছে। গঠনতন্ত্র সংশোধন করে অমুসলিমদের জামায়াতের সদস্য হবার পথে বাধা দূর করা হয়েছে। এখন একজন অমুসলিমও চাইলে জামায়াতের সদস্য হতে পারবেন। জামায়াতের মহিলা সদস্যদের মজলিশে শূরার সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়েছে। এসবই করা হয়েছে প্রয়োজন, সময়ের দাবী এবং বাস্তবতার আলোকেই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য।

১৯. জামায়াত বর্তমান সময়ে যে ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে গিয়েছে তাতে গা ছেড়ে বসে না থেকে বিকল্প পথের সন্ধান করা হিকমত ও দূরদৃষ্টির দাবী। এটা কোনো ধরনের বিচ্যুতি নয়। বরং আন্দোলনের ক্রমবিকাশের ধারাতেই নতুন কৌশল অবলম্বন করা। এক্ষেত্রে মিসরের ইখওয়ানের কথা বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে ইখওয়ান পুনরুজ্জীবিত না করেও তারা অন্যদল বা স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচন করছেন। ইখওয়ান নাই অথচ ইখওয়ান আছে। ধৈর্যের সাথেই তারা কাজ করে যাচ্ছেন এবং নির্বাচনও করছেন। জর্দানে ইখওয়ান প্রশাসনের সাথে মোটামুটি সহনশীলতা বজায় রেখে সেখানকার

রাজনীতি ও নির্বাচনে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এককথায় তারা কোয়ালিশন সরকারেও অংশ নিয়েছিলেন।

আলজেরিয়ায় ইখওয়ানের নেতৃত্ব মূল ইখওয়ান থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে ইসলামিক ফ্রন্ট গঠন করে কাজ করছেন। ইয়েমেনে ট্রাডিশনাল ইসলামপন্থীদের সাথে নিয়ে আল-ইসলাহ পার্টি গঠন করে সেখানে কাজ করছেন। এককথায় কোয়ালিশন সরকারেও ছিলেন। কিছুদিন আগে কোয়ালিশন থেকে বের হয়ে এসেছেন। মরক্কোতে জাস্টিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি নাম দিয়ে কাজ করছেন। এখন প্রধান বিরোধী দল হিসাবে আছেন। সামনের নির্বাচনে আরও ভালো করার কথা। সুদানে ইসলামিক মুভমেন্ট অব সুদান নামে জেনারেল হাসান আল বশিরের সাথে জোট গঠন করে সরকার পরিচালনা করছেন। অবশ্য একজন সিনিয়র নেতার সাথে তাদের মতদ্বৈততা রয়েছে এবং তিনি সরকারের বাইরে আছেন। তিনি হলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. হাসান তুরাবী।

তুরস্কে ইসলামী আন্দোলন বার বার নাম পরিবর্তন করেছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাজমুদ্দিন আরবাকানের সাথে মতপার্থক্য সৃষ্টি হওয়ায় দ্বিধাবিভক্তি আসার পরও জাস্টিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি, যাকে বলা হয় একে পার্টি, তারা সরকার গঠন করে সাফল্যের সাথে দেশ চালাচ্ছে আব্দুল্লাহ গুল এবং রিসেপ তাইয়েপ এরদোগানের (রজব তৈয়ব এরদোগান) নেতৃত্বে। কিন্তু পিছন থেকে শক্তি ও সমর্থন যোগান দিয়ে যাচ্ছে সাদ্দ বদিউজ্জামান নুরসীর নূর জামায়াতের লোকেরা। সাম্প্রতিক রেফারেন্ডামে একে পার্টি জয়লাভ করার পর প্রধানমন্ত্রী এরদোগান ফতেহ উল্লাহ গুলেনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এই ফতেহ উল্লাহ গুলেন হলেন সাদ্দ নুরসীর প্রতিষ্ঠিত আন্দোলনের নেতা। বলতে গেলে পর্দার অন্তরাল থেকে তুরস্কের ইসলামী আন্দোলনকে এগিয়ে দিচ্ছেন। ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়াতেও ইসলামী আন্দোলন পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে তাদের কর্মপন্থা ও কৌশল গ্রহণ করেই এগিয়ে চলছে। সুতরাং বর্তমান সংকট সন্ধিক্ষণে এসে বাংলাদেশের জন্যও একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে আন্দোলনকে একটি নতুন অধ্যায়ে নিয়ে যাওয়ার।

২০. যেহেতু স্বাধীনতার বিরোধিতা ও যুদ্ধাপরাধের মিথ্যা অভিযোগ এনে সম্ভাবনাময় একটি ইসলামী আন্দোলনকে গলাটিপে হত্যা করার অপচেষ্টা করা হচ্ছে, এবং যেহেতু বিষয়টি আমরা মিটমাট করতে পারিনি অথবা এই রাজনৈতিক বিরোধটি নিরসন করতে পারিনি, যেহেতু আমরা অনেকেই মনে করেছিলাম এটা এক সময় এমনিতেই শেষ হয়ে যাবে, যেহেতু আমাদের অনেকের চিন্তার গন্ডি অতিক্রম করে এটাকে একটি জুলন্ত ইস্যু হিসাবে আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে, যেহেতু সরকারও এ বিষয়ে অবশ্যই একটা কিছু করতে বদ্ধপরিকর এবং যেহেতু কিছু না হলেও দল ও নেতৃত্বের ভাবমর্যাদা ধুলায় লুপ্ত হয়ে গেছে এবং জনমনে এক ধরনের নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছে, সেহেতু সামগ্রিক বিবেচনায় নতুন কর্মপন্থা ও কর্মকৌশল নির্ধারণ করা সময়ের অনিবার্য দাবী।

আমরা যদি নতুন কর্মকৌশল গ্রহণে ব্যর্থ হই ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না এবং আমরা ইতিহাসের কাছে দায়ী হয়ে যাবো। কারণ এক বিপুল সংখ্যক মানুষের মাঝে আমরা আশাবাদ জাগিয়েছিলাম। আমাদের আন্দোলনের সাথে লক্ষ লক্ষ মানুষ একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। আমাদের ছাত্র তরুণদের বিরাট এক কাফেলা জীবন দিয়েছে, শহীদ হয়েছে, পঙ্গু হয়েছে, অনেকে তাদের জীবন ও যৌবন এই পথে নিঃশেষ করে দিয়েছে।

সুতরাং এক নম্বর যে বিকল্প উল্লেখ করা হয়েছে সেভাবে হাল ছেড়ে দিলে আমরা অর্থব প্রমাণিত হবো। তখন সময় চলে যাবে। সুতরাং সময় থাকতেই আমাদের সতর্ক হতে হবে। তিন নম্বর যে বিকল্পের উল্লেখ করেছি সেটাও সমাধান নয়। শুধু স্থানীয় অধার্মিক শক্তি নয় বরং আন্তর্জাতিক ধর্মহীন শক্তিও আমাদের জন্য বড় অন্তরায়। তারাও ওৎ পেতে আছে কিভাবে আমাদের অগ্রযাত্রা রুখে দেয়া যায়। আর এ কারণেই এই বিকল্প পছন্দ এখন আমাদের জন্য খুব সহায়ক হবে না। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আস্থা অর্জনের দিকটা সামনে রেখেই কৌশল নির্ধারণ করতে হবে।

২১. পরিষ্কৃত খুব নাজুক। নির্মোহ ও নিরপেক্ষভাবে চিন্তাভাবনা করতে হবে। নিজেকে সম্পৃক্ত করে চিন্তা করলে সমস্যার সমাধান হবে না। আপাতদৃষ্টিতে জামায়াতে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়েছে এমনটি মনে হলেও ক্ষতির কিছু নেই। বরং হেকমতের খাতিরে তেমন একটা কিছু করে হলেও নতুন আন্দোলন দাঁড় করানোর ঝুঁকি গ্রহণ করা উচিত।

এক: বাংলাদেশের সংবিধান সামনে রেখে যে ধরনের সংগঠন হলে কোনো প্রশ্ন থাকবে না সে ধরনের সংগঠন করতে হবে। এক্ষেত্রে ন্যায়বিচার এবং সুশাসন কায়মকে অবলম্বন করতে হবে। একে পার্টির গঠনতন্ত্র এবং মেনিফেস্টোর দৃষ্টান্ত সামনে রেখে দলের গঠনতন্ত্র তৈরি করতে হবে। তবে তাদের গঠনতন্ত্র ও মেনিফেস্টোতে অনেক কিছু পুনরাবৃত্তি আছে এবং বেশ দীর্ঘও বটে। ওটাকে সংক্ষেপ করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট সামনে এনে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ও চুম্বক বিষয়গুলো সন্নিবেশিত করতে হবে। জনগণের অতি প্রয়োজনীয় কিছু ইস্যুকে হাইলাইট করতে হবে।

দুই: ছায়া মন্ত্রিসভার কনসেপ্ট গ্রহণ করতে হবে। যতটা মন্ত্রণালয় আছে ততটি ডিপার্টমেন্ট করে প্রতি ডিপার্টমেন্টে কমপক্ষে দুইজন সদস্যকে দায়িত্ব দিতে হবে। একজন প্রধান দায়িত্বশীল হবেন এবং অপরজন হবেন তার সহকারী দায়িত্বশীল। এদেরকে নিয়েই কেন্দ্রীয় কমিটি হতে হবে। এক ব্যক্তিকে একাধিক দায়িত্ব দেয়া পরিহার করতে হবে। ব্যাপক কেন্দ্রীকরণ করতে হবে।

তিনি: একটি অভিভাবক পরিষদ বা উপদেষ্টা পরিষদ থাকবে। সিনিয়র সিটিজেন, বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন ও পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ এর সদস্য থাকবেন।

চার: একটি ওলামা কাউন্সিল বা শরীয়া বোর্ড থাকবে। নানা বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম চালাবে এবং নতুন প্রশ্ন সৃষ্টি হলে তা নিরসন করবেন। যে কোনো মূল্যে ইসলামী ঐক্য গড়ে তুলতে হবে এবং এ জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে।

পাঁচ: তিন টার্মের বেশি কেউ একাধারে কেন্দ্রীয় সভাপতি বা জিলা সভাপতি থাকতে পারবেন না। পদ পদবী বা দায়িত্বের ব্যাপারে বাংলা পরিভাষাই ব্যবহৃত হবে। সংগঠনের সকল পর্যায়ে আইটি-এর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

ছয়: কেন্দ্রীয় কমিটিতে সকল পেশার লোকদের প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে। এসব ক্ষেত্রে জনশক্তি পরিকল্পনা করতে হবে। প্রতিবছর কোন ক্ষেত্রে কি পরিমাণ প্রোডাক্ট চাই তা নির্ধারণ করতে হবে।

সাত: একটি সেক্রেটারিয়েট থাকবে যারা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করবেন না। সমন্বয় করবেন কিন্তু কোনোকিছু চাপিয়ে দিবেন না।

আট: সকল ডিপার্টমেন্টের কমিটি থাকবে এবং ওসব কমিটি অনেকটা স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করবে। সকল ডিপার্টমেন্ট সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

নয়: একটি লিগেল এইড কমিটি থাকবে। আইনগত সহযোগিতা ছাড়াও সংগঠনের অভ্যন্তরে কোনো সমস্যা দেখা দিলে এই কমিটি দ্রুততার সাথে তার নিরসন করবে এবং কেন্দ্রের পক্ষ থেকে শালিস হিসাবে কাজ করবে।

দশ: অগ্রাধিকার দিতে হবে :- (১) শিক্ষা, (২) সমাজসেবা, (৩) স্বাস্থ্য, (৪) মিডিয়া, (৫) ব্যবসা-বাণিজ্য ও (৬) ছাত্র আন্দোলন।

এগার: নির্বাচনের জন্য প্রথমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে নির্বাচনের যোগ্যতা অর্জনের জন্য সম্ভাবনাময় লোকদের এখন থেকে তৎপরতা চালাতে হবে।

বার: জেলা পর্যায়ে স্বাধীন পেশা-ব্যবসা, ওকালতি, শিক্ষকতা ইত্যাদির ব্যাপারে লোকদের পরামর্শ দিতে হবে। দায়িত্বশীলের সামাজিক পরিচিতি থাকতে হবে— শুধুমাত্র দলীয় পরিচিতি নয়।

তের: জামায়াত একটি অবকাঠামো করেই রেখেছে বিশেষ করে অনেকগুলো সহযোগী প্রতিষ্ঠান আছে। এগুলোকেও যথাযথভাবে গতিশীল করতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠান ঝিমিয়ে আছে এবং পরিবর্তন অনিবার্য। যেমন- মসজিদ মিশন, ইসলাম প্রচার সমিতি, এডুকেশন সোসাইটি, আধুনিক, দারুল আরাবিয়া ও দারুল ইফতা, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন, চাষী কল্যাণ সমিতি, মওদুদী একাডেমী, সোনার বাংলা প্রকাশনী, আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, দারুল ইসলাম ট্রাস্ট, তামিরুল মিল্লাত ট্রাস্ট, মারুফ একাডেমী,

ফয়সল ইন্সটিটিউট, মানারাত স্কুল এন্ড কলেজ, মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ইবনে সিনা ট্রাস্ট এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান। বিআইসির কথা উল্লেখ করলাম না কারণ এখানে যিনি আছেন তিনি পরিবর্তনে বিশ্বাসী নন। এ সকল প্রতিষ্ঠানেই সম্পদ আছে। ক্রমান্বয়ে এসব প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তন আনতে হবে এবং গতিশীল করতে হবে। জেলা পর্যায়েও অনেক ট্রাস্ট ও প্রতিষ্ঠান আছে যা কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে। মানারাত ও বাদশাহ ফয়সল স্কুল এন্ড কলেজ অথবা তামিরুল মিল্লাত টঙ্গিকে কেন্দ্র করেও বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান করা যায়, সফিপুরে ওয়ামীর একটা জায়গা পড়ে আছে সেখানেও বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব। তাছাড়া বিভাগীয় হেডকোয়ার্টারগুলোতে যেসব প্রতিষ্ঠান আছে ওসব প্রতিষ্ঠানকে আরো সম্প্রসারিত ও সমৃদ্ধ করা সম্ভব। প্রত্যেক জেলায় প্রথম শ্রেণীর স্কুল ও ইন্টারমেডিয়েট কলেজ গড়ে তোলার মাধ্যমে মেধাবীদের রিক্রুট করা সম্ভব।

মোদাকথা আমাদের যে শক্তি, অর্থ, মেধা রয়েছে তা উল্লেখিত অগ্রাধিকার খাতসমূহে ব্যয় করার মাধ্যমে পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যেই আমরা একটা পর্যায়ে পৌঁছে যেতে পারি। বাইরে অবস্থানরত জনশক্তিকে প্রয়োজনে দেশে ফেরত আনতে হবে। আবার উচ্চতর শিক্ষা ও আন্দোলনের প্রয়োজনে জনশক্তি বাইরে রফতানি করতে হবে।

চৌদ্দ: ক্রিকেট, ফুটবল ও হকি টিম গঠন করতে হবে ইয়ুথ ডিপার্টমেন্টের অধীনে অথবা ছাত্রদের সহায়তায়। এ জন্য প্রয়োজনে ক্লাব স্থাপন করা যেতে পারে।

পনর: একটি আন্তর্জাতিক ভাষা ইন্সটিটিউট করা যেতে পারে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে। স্পোকেন ইংলিশ, আরবী, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ম্যান্ডারিন, জাপানী, কোরিয়ান, বাহাসামালয়া ইত্যাদি ভাষা শিক্ষা কোর্স চালু করা যেতে পারে।

ষোল: সর্বাবস্থায় 'ইউনিভার্সিটি অব থট' ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। এটাকে সম্প্রসারিত ও গতিশীল করতে হবে।

সতের: 'ভোরের ডাক' পত্রিকাটি কিনে নিয়ে একটি রাজধানী কেন্দ্রিক ৪ পৃষ্ঠার সফল কাগজ করা যায়। সাংবাদিক (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক) তৈরি করে বিভিন্ন পত্রিকায়, চ্যানেলে ঢুকাতে হবে। এ ব্যাপারে নিবিড় তৎপরতা অব্যাহত রাখতে হবে। একাধিক থিংক ট্যাংক গড়ে তুলতে হবে।

আঠার: শিশু কল্যাণ ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বর্তমান কাঠামো রেখেই আরো গতিশীল ও সম্প্রসারিত করতে হবে। নারী সমাজের উন্নয়ন, মানবাধিকার সংরক্ষণ ও পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে সুস্পষ্ট কার্যক্রম থাকতে হবে।

উনিশ: অমুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে সামাজিক ও একটি ওয়ার্কিং রিলেশন গড়ে তুলতে হবে। এ জন্য কিছু লোককে নিবেদিত প্রাণ হয়ে ঐ সেক্টরে কাজ করতে হবে। উপজাতীয়দের মধ্যে কিছু লোক নিয়োজিত করতে হবে।

বিশ: তৈরি পোশাক শিল্পে শ্রমিকদের মাঝে এবং ব্যবস্থাপনায় জরুরিভিত্তিতে একটি সেল করে কাজ করতে হবে। এখানে প্রশিক্ষণ দিয়ে ভাল কর্মসংস্থান হতে পারে— তার সুযোগ নিতে হবে। এটা বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম লাইফ লাইন হিসাবে বিবেচিত হবে এবং ভূমিকা পালন করবে। ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিতে শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করা খুব সহজ। কিন্তু আমরা কোন মনোযোগ দেইনি।

একুশ: আনুপাতিক পদ্ধতির নির্বাচন চালু করার প্রশ্নে জনমত গঠন করা উচিত। বাংলাদেশকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করে সরকারের কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ করা জরুরী। সাড়ে ষোল কোটি মানুষের দেশে সবকিছু রাজধানী মুখী যা unmanageable। সামাজিক শক্তি অর্জন করতে হবে। প্রচারমুখীতার পরিবর্তে সমাজের বিভিন্ন পেশা ও বিভিন্ন স্তরের চালিকা শক্তির উপর আদর্শিক ও নৈতিক প্রভাব সৃষ্টি করতে হবে। রাজনীতি প্রবণতার পরিবর্তে আন্দোলনের প্রকৃতি হতে হবে সামাজিক ধাচের ও মানবকল্যাণধর্মী।

পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে এই নতুন কর্মকৌশল গ্রহণের ব্যাপারে জনশক্তির মাঝে আলোচনা ও মতবিনিময় হওয়া উচিত। একটা ঐকমত্যে পৌঁছার জন্য সার্বিক প্রয়াস চালানো দরকার। জামায়াত আমাদেরকে অসাধারণ শৃঙ্খলা শিক্ষা দিয়েছে সেই সাংগঠনিক শৃঙ্খলার মধ্যে আমাদের থাকতে হবে। শৃঙ্খলার মধ্যে থেকে সংগঠনের অভ্যন্তরে পরিবর্তন আনতে হবে। জনশক্তি বিকল্প পথের সন্ধান করছে। দেশের ভিতরে এবং বাইরে নতুন চিন্তাধারাকে দারুণভাবে অভিনন্দন জানাবে। দূরের চিন্তা যারা করেন না কিংবা স্থিতাবস্থা বজায় রাখাটাই যারা ভাল মনে করেন তারা হয়তো বা বিরোধিতা করতে পারেন। তবে তাদেরও আন্তরিকতার অভাব নেই। ধৈর্যের সাথে সবাইকে বুঝাতে হবে এবং ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে অথবা কমপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে ইতিহাসের এই সংকট সন্ধিক্ষণে আন্দোলনের জন্য নতুন কৌশল নির্ধারণ এক ঐতিহাসিক অনিবার্যতা। আমি বিশ্বাস করি মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সঠিক পথ দেখাবেন।

ক্ষমতার রাজনীতি, ধর্মহীনতার রাজনীতির মিথ্যা অভিযোগের নির্মম শিকার হয়ে আমার বন্দী জীবনের অনুভূতি সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করছি:

১. বর্তমান সরকার যতদিন ক্ষমতায় আছে আমাদের মুক্তির কোনো সম্ভাবনা নেই। সহসা সরকার পরিবর্তনেরও কোনো সম্ভাবনা নেই।

২. আন্দোলন করে আমাদের মুক্ত করা হবে এমন কোনো সম্ভাবনাও নেই। আন্দোলন করে সরকারের পতন ঘটানো কোনো আশংকাও নেই। পুরো মেয়াদ পর্যন্তই সরকার ক্ষমতায় থাকবে।

৩. বর্তমান সরকারের মেয়াদের মধ্যেই আমাদের কিছু সংখ্যকের বিচারের নামে প্রহসন হবে। কারণ ইস্যুটাকে এমন পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে।

৪. তথাকথিত আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের কাছে কোনো ন্যায়বিচার আমরা পাবো না। আইনটা একটা কালো আইন হওয়ার কারণে সরকার যা চাইবে তাই করা বা তাদের কাঙ্ক্ষিত রায় দেবারই সুযোগ রয়েছে।

৫. জামায়াতের উপর এবং জামায়াতের নেতা হিসাবে আমাদের উপর সুস্পষ্ট জুলুম হচ্ছে এ জন্য অনেকে দুঃখ প্রকাশ বা নিন্দা করলেও দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী কার্যকরভাবে আমাদের তথা জামায়াতের পক্ষ অবলম্বন করবে না।

৬. আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বিচার কাজের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মৌখিক সৌজন্য প্রকাশ করলেও একটি ইসলামী দলের নেতাদের শাস্তি হলে (তা যত অন্যায়াভাবেই হোক না কেন) ভিতরে ভিতরে তারা অখুশী হবে না।

৭. জামায়াতের নেতৃবৃন্দকে মানবতাবিরোধী অপরাধ, যুদ্ধাপরাধের মত স্পর্শকাতর ইস্যুতে বিচার করার পর জামায়াতকে সরকার নিষিদ্ধ না করলেও জামায়াতের ভাবমর্যাদা দারুণভাবে ক্ষুণ্ণ হবে। দেশের ভিতরে ও বাইরে জামায়াতকে যুদ্ধাপরাধী, বাংলাদেশ বিরোধী, স্বাধীনতা বিরোধীদের দল হিসাবে চিত্রিত করবে। ফলে জামায়াতের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ধ্বংস হয়ে যাবে। জামায়াতের ভাবমর্যাদা পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

৮. জামায়াতকে নিষিদ্ধ না করলেও সরকার জামায়াতকে স্বস্তির সাথে কোনো কাজ করতে দিবে না। সর্বদা চাপের মুখে রাখবে।

৯. এহেন পরিস্থিতিতে জামায়াতের পক্ষে গণসংগঠনে পরিণত হওয়া বা নির্বাচনে জনগণের বিপুল সমর্থন লাভের যোগ্যতা অর্জন কখনো সম্ভব হবে না।

১০. বর্তমান সরকারের মেয়াদ শেষে যে নির্বাচন হবে তাতেও জামায়াত ভাল করতে পারবে এমন কোনো সম্ভাবনাও দেখছি না।

১১. জামায়াতের প্রতি আমাদের যে আবেগ, ভালোবাসা ও মহব্বত তাতে জামায়াত ছাড়া আমরা অন্য কিছু ভাবতেও পারি না। জামায়াতকে উপেক্ষা করে কিছু করতে গেলে ভুল বোঝাবুঝি অনিবার্য এবং কিছু করলেও তা সফল ও জনশক্তির নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

এই জায়গায় এসে আমরা এখন থমকে দাঁড়িয়েছি। প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ কি?

এক. যা হবার হবে। আমরা যেমন আছি তেমনি থাকবো (বর্তমানে এই কৌশলই অবলম্বন করা হয়েছে)।

দুই. পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জামায়াত সিদ্ধান্ত নিয়ে পিছনে থেকে একটি নতুন সংগঠন গড়ে তুলবে। এই সংগঠন প্রজ্ঞা ও দৃঢ়তার সাথে ধর্মহীন শক্তির মোকাবিলা করবে।

তিন. আমাদের যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের মিথ্যা অভিযোগ আনা হচ্ছে তারা জামায়াতের নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়াবো এবং সম্পূর্ণ নতুন লোকদের হাতে জামায়াতকে ছেড়ে দেবো। অর্থাৎ একটা new generation Jamaat হবে এটি।

আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় উপরোক্ত তিন অবস্থার প্রথমটা হচ্ছে নেতৃত্ব আঁকড়ে থাকা, হতবুদ্ধিতা এবং হতাশাবাদিতা। একটি গতিশীল আন্দোলন এ ধরনের পশ্চাৎমুখী অবস্থান গ্রহণ করতে পারে না।

তৃতীয় যে পন্থা নতুন নেতৃত্বের হাতে জামায়াতকে ছেড়ে দেয়া এটা বিবেচনা করা যেত যদি ১৯৭১ সালের বিষয়টার একটা রাজনৈতিক মীমাংসা বা মিটমাট আমরা করতে পারতাম। জামায়াতের ভাবমর্যাদা যেভাবে ভুলুপ্তি করা হয়েছে, জামায়াত সম্পর্কে যে এলার্জি তৈরি করা হয়েছে, পাঠ্যপুস্তক, মিডিয়ায় এবং রাজনৈতিক প্রচারণায় যেভাবে জামায়াতকে স্বাধীনতা বিরোধী বাংলাদেশ বিরোধী দল হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে তাতে নতুন নেতৃত্ব হলেও দেশের সাধারণ মানুষ, নতুন প্রজন্ম এবং রাজনৈতিক মহল জামায়াতকে সহজে গ্রহণ করে নিতে পারবে না।

দ্বিতীয় যে পন্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, আমার মতে সামগ্রিক বিবেচনায় এই বিকল্প পন্থাটির কথা চিন্তা করা যেতে পারে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ইসলামী আন্দোলন এই কৌশল অবলম্বন করে ভাল ফল লাভ করেছে। আমাদের সামনে তুরস্ক, মিসর, আলজেরিয়া, সুদান, ইয়ামেন, মরক্কো, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, জর্দানসহ পৃথিবীর প্রায় সকল ইসলামী আন্দোলন পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে নতুন কৌশল অবলম্বন করেই এগিয়ে চলেছে।

তাছাড়া আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে বিবেচ্য। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের ইসলামী আন্দোলনের নেতাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনে বিরোধিতা করার মত অতি স্পর্শকাতর কোনো অভিযোগ নেই। এটা স্বীকার করতেই হবে যে বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলন খুবই সম্ভাবনাময় আন্দোলন হওয়া সত্ত্বেও এই দুর্ভাগ্যজনক ও স্পর্শকাতর অভিযোগ আন্দোলনের রাজনৈতিক সাফল্য ও গ্রহণযোগ্যতার পথে বড় বাধার সৃষ্টি করে আছে। ইসলামী আন্দোলনের দূশমনরা আমাদের বিরুদ্ধে প্রচারণায় ও কৌশলে আপাতত সফল হয়ে গিয়েছে।

রাজনৈতিকভাবে বিষয়টি মিটমাট করতে না পারার কারণে আজ বাস্তবেই মিথ্যা অভিযোগ মাথায় নিয়ে আমরা বিচারের কাঠগড়ায়। আমরা ১৯৭১ সালে জামায়াতের

নেতৃত্ব দেইনি, জামায়াত রাজনৈতিকভাবে সমর্থন করলেও তখনকার দলীয় নেতারাও যুদ্ধে শরীক ছিলেন না, নেতৃত্ব দেয়া তো দূরের কথা। আমাদের যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হচ্ছে তারা কেউই যুদ্ধ করিনি বা কোন বাহিনীরও সদস্য ছিলাম না। আমাদের দ্বারা যুদ্ধাপরাধ, গণহত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ বা লুটতরাজের প্রশ্নই উঠে না। আজ রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হবার কারণেই রাজনৈতিক প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার শিকার আমরা বা জামায়াত। আমাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ সাজানো এবং সর্বৈব মিথ্যা। আমাদেরকে নিয়ে সরকার ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে।

আমরা নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়িলাম যাতে বিভ্রান্তির কোনো সুযোগ না থাকে। এ ধরনের একটি অবস্থান গ্রহণ করলে সাময়িকভাবে আমাদের জন্য ব্যক্তিগতভাবে অবমাননাকর মনে হলেও শেষ পর্যন্ত মহত্বের দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে বলে আমার বিশ্বাস। আমাদের অনেকের তো বয়সও হয়েছে। সরাসরি আন্দোলনে থাকলেই বা আমরা আর কতটা অবদান রাখতে পারবো? সুতরাং সবাই মিলে দ্বিতীয় যে বিকল্পটির কথা উল্লেখ করেছি তা সামনে রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই হবে কাজিাত এবং যুক্তিযুক্ত। দোয়া করি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাল্লা আমাদেরকে একটি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার তওফিক দান করুন। আমিন!

মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

২৬শে নভেম্বর, ২০১০।

৭ সেল (বকুল), ২নং কক্ষ।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, ঢাকা।

বিবেচনায় আনতে হবে সবকিছু* শামসুন্নাহার নিজামী

প্রথম পর্ব

জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ নেতৃবৃন্দ এখন জেলে। দেশের তৃতীয় বৃহত্তম এ রাজনৈতিক দল নিয়ে ঔৎসুক্যের শেষ নেই। অনেকেই দলটির এ অবস্থাকে ‘খুবই নাজুক’ অথবা দলটি ‘কঠিন চ্যালেঞ্জে’ আছে মনে করেন। মূলত জামায়াতে ইসলামীর সঠিক স্বরূপ না জানার কারণেই এ কথাগুলোর সৃষ্টি হয়। জামায়াতে ইসলামী গতানুগতিকভাবে কোন রাজনৈতিক দল নয়। বরং জামায়াতে ইসলামী একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন।

ইসলামী আন্দোলন অতীতে নবী রাসূলগণ দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। এ দুনিয়াতে মানুষের সমাজে পূর্ণাঙ্গ শান্তি কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আখেরাতে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচার জন্যে আল্লাহ রাক্বুল আলামীন পথ প্রদর্শক হিসেবে যুগে যুগে নবী রাসূল পাঠিয়েছেন। দুনিয়ার প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত অসংখ্য নবী রাসূল এসেছেন। তারা সবাই ছিলেন মানবতা মনুষ্যত্বের পূর্ণাঙ্গ সার্থক মডেল। তারা নিজেরা যেমন নিজের মনগড়া পথে চলেননি, আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলেছেন তেমনি মানুষকেও আল্লাহর পথে ডেকেছেন। সমস্ত নবী রাসূল একই আহবান জানিয়েছেন, “হে আমার জাতির জনগণ তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কর। কোনো গাইরুল্লাহর দাসত্ব করো না।”

শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) ছিলেন মানবতার সর্বশেষ মডেল। তিনি এসেছিলেন এক অশান্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজে। সেই সমাজকে, সেই সমাজের মানুষকে তিনি আল্লাহর দেয়া হেদায়েতের আলোকে আলোকিত করে একটি সুন্দর সমাজ, একদল উন্নত নৈতিকতা সম্পন্ন মানুষে পরিণত করেছেন। এটা সম্ভব হয়েছিল শেষ কিতাব ‘আল

* লেখক বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মহিলা বিভাগের সেক্রেটারি। কামারজ্জামানের চিঠি নিয়ে পত্রপত্রিকায় রিপোর্ট ছাপা হওয়ার পর চিঠির জবাব হিসেবে দুই পর্বে সাপ্তাহিক সোনার বাংলায় এই লেখাটি প্রকাশিত হয়। লিংক:

কোরআনের’ বদৌলতে। নবুয়তের পূর্বে দীর্ঘ ৪০ বছর তাঁর কেটেছিল অত্যন্ত ভালো। সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা এগুলো ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এ জন্যে সবাই তাঁকে ‘আল-আমীন’, ‘আস-সাদিক’ উপাধি দিয়েছিল। কিন্তু এই সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটিও নবুয়ত-পূর্ব যুগে সর্বাত্মক চেষ্টা করেও সেই সমাজে কোনো পরিবর্তন আনতে পারেননি। কিন্তু নবুয়ত লাভের পর মাত্র ২৩ বছরে আল্লাহর দেয়া হেদায়েতের বদৌলতে কাজিফত পরিবর্তন সাধন করেন।

এ থেকে বুঝা যায় মানুষের নিজের চেষ্টায় এ কাজ সম্ভব নয়, বরং এর জন্যে প্রয়োজন আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়েত। সেই হেদায়েত আমাদের কাছে অবিকৃত আছে, সেটা কোরআন এবং সুন্নাহ। রাসূল (সা)-এর হাদীস, যতদিন তোমরা এটাকে আঁকড়ে ধরে থাকবে ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না।

জামায়াতে ইসলামী সেই দল যারা কোরআন এবং সুন্নাহর এই পথেই চলে। এ দল দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে এ পথেই কেবল মানবতা মনুষ্যত্বের কল্যাণ সম্ভব। জামায়াত মনে করে যে কোন পরিস্থিতিতে বা পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে নতুন কোনো কর্মকৌশল নয় বরং শাস্ত্রত সেই কর্মকৌশল অবলম্বন করতে হবে যে কর্মকৌশল অবলম্বন করেছিলেন মানবতার মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মদ (সা)। পরিস্থিতি যতই নাজুক হোক, চ্যালেঞ্জ যত কঠিনই হোক ‘শটকট’ কোনো পথ নেই। কারণ এ হেদায়েত নির্দেশনা এসেছে সেই মহান সত্তার পক্ষ থেকে যিনি সমস্ত বিশ্ব জাহানের রব। যার কাছে অতীত, বর্তমান ভবিষ্যৎ সব পরিষ্কার। তিনি যেমন অতীতকে জানেন তেমন বর্তমান দেখেন এবং ভবিষ্যতে কি হবে তাও জানেন। বান্দার সামনে যা আছে তাও তিনি জানেন আবার পিছনে যা আছে তাও জানেন। তিনি মানুষের শেখার জন্য, বুঝার জন্য কোরআন মজিদে বিভিন্ন ঘটনাবলীর বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন নবী রাসূলের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। সরাসরি কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন। যা শুধু সুর করে তেলাওয়াতের জন্য নয়। নয় জ্ঞান অর্জন করে নিজেকে পন্ডিভ হিসেবে জাহির করার জন্য বরং বাস্তব জীবনে যখন ইসলামী আন্দোলন করতে গিয়ে বাতিলের মোকাবেলা করতে কঠিন চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে গিয়ে জীবনে বাস্তবে অনুসরণ করার জন্য। কোরআনের ঘোষণা :

“তোমরা কি মনে করেছো যে, তোমরা অতি সহজেই জান্নাতে চলে যাবে? অথচ এখনও তোমরা সে লোকদের অবস্থায় আসনি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের উপর বহু বিপদ মুসিবত ও দুঃখ কষ্ট এসেছে তাদেরকে অত্যাচার নির্যাতনে এমনভাবে জর্জরিত করে দেয়া হয়েছিল যে, শেষ পর্যন্ত তৎকালীন রাসূল এবং তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তারা আর্তনাদ করে বলে উঠেছিল, আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে? তখন তাদেরকে সাহুনা দিয়ে বলা হয়েছিল, আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে।” (সূরা আল-বাকারা-২১৪)

“তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে তোমরাই বিজয়ী হবে। যদি তোমরা (এখন ওহুদ যুদ্ধে) আঘাতপ্রাপ্ত হও, তাহলে তারাও তো (বিরোধী পক্ষ) তেমনি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে (বদরের যুদ্ধে)। আর এ দিনগুলো আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি। আর এ সময় ও অবস্থাদি তোমাদের উপর এ জন্যে আনা হয়েছে যে, আল্লাহ জানতে চান তোমাদের মধ্যে কারা সাচ্চা মুমিন। আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করতে চান। আর আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেন না। তিনি এই পরীক্ষার মাধ্যমেই সাচ্চা মুমিনদেরকে বাছাই করে নিয়ে কাফেরদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চান। তোমরা কি মনে করে নিয়েছো, তোমরা এমনিতেই জাহান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ এখনো আল্লাহ দেখেননি তোমাদের মধ্যে কে তাঁর পথে জিহাদ করেছে এবং কে তাঁর জন্যে সবরকারী।” (সূরা আল ইমরান-১৩৯-১৪৩)

“যেদিন দু’দল সৈন্যের মোকাবিলা হয়েছিল সেদিন তোমাদের যে ক্ষতি হয়েছিল তা আল্লাহর হুকুমেই হয়েছিল এবং তা এ জন্যে হয়েছিল যাতে আল্লাহ দেখে নেন কে তোমাদের মধ্যে মুমিন এবং কে মুনাফিক।” (আল ইমরান-১৬৬-১৬৭)

“তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমাদেরকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ আল্লাহ এখন পর্যন্ত দেখেননি তোমাদের মধ্যে কে (তাঁর পথে) যুদ্ধ করেছে এবং কে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে। আর তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ সে বিষয়ে পূর্ণ অবহিত।” (আ/ত তওবাহ-৯৬)

“মানুষ কি মনে করে যে, তারা ‘আমরা বিশ্বাস করি’ এ কথা বলেই ছাড়া পেয়ে যাবে? এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আমি তো তোমাদেরকে পরীক্ষা করেছি যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নিবেন কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী।” (আল আনকাবুত-২-৩)

“আমি তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করবো, যতক্ষণ না প্রকাশ হয় কে কে তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী এবং কে কে সবরকারী এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থা যাচাই করি।” (সূরা মুহাম্মাদ-৩১)

“আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদ আসে না এবং যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সৎ পথ দেখান, আর আল্লাহ সব বিষয়ে অবগত আছেন।” (আ/ত তাগাবুন-১১)

“পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোনো বিপদ আসে না, কিন্তু তা জগৎ সৃষ্টির আগেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। এটা এ জন্য বলা হয়, যাতে তোমরা যা হারাও তাতে দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদের যা

দিয়েছেন, তার জন্য উল্লসিত না হও। আল্লাহ কোনো উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।” (আল হাদীস-২২-২৩)

আল কোরআনের অনুরূপ রাসূল (সা)-এর বর্ণনায়ও (আল হাদীস) অনুরূপ কথা এসেছে:

হযরত আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “রাসূল (সা) বলেছেন, মুমিন নর-নারীর উপর সময় সময় বিপদ ও পরীক্ষা এসে থাকে, কখনো সরাসরি তার জীবনের উপর বিপদ আসে, কখনো তার সন্তান মারা যায়, আবার কখনো তার ধনসম্পদ ধ্বংস হয়। অবশেষে সে এমন অবস্থায় আল্লাহর সাথে মিলিত হয় যে, তার আমলনামায় আর কোন গুনাহ অবশিষ্ট থাকে না।” (তিরমিজি)

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, বিপদ আপদ ও পরীক্ষা যতো কঠিন হবে তার প্রতিদানও হবে ততো মূল্যবান। আর আল্লাহ যখন কোন জাতিকে ভালবাসেন তখন অধিক যাচাই ও সংশোধনের জন্য তাদেরকে বিপদ মুসিবত ও পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। অতঃপর যারা আল্লাহর সিদ্ধান্তকে খুশি মনে মেনে নেয় এবং ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হন। আর যারা এ বিপদ ও পরীক্ষায় আল্লাহর উপর অসন্তুষ্ট হয় আল্লাহও তাদের উপর অসন্তুষ্ট হন। (তিরমিজী) এবং (মালিক তার) মেষ পালনের ব্যাপারে নেকড়ে ছাড়া (বাঘ) অন্য কারো ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা খুবই তাড়াহুড়া করেছো।” (বুখারী)

হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “একদা আমরা নবী করীম (সা)-এর নিকট (আমাদের দুঃখ-দুর্দশা ও অত্যাচার-নির্যাতন সম্পর্কে) অভিযোগ করলাম। তখন তিনি তার চাদরটিকে বালিশ বানিয়ে কাবাঘরের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, আমরা তাঁকে বললাম, আপনি কী আমাদের জন্যে আল্লাহর কাছে সাহায্য চান না? আপনি কী আমাদের জন্যে দোয়া করেন না? তখন তিনি বললেন, (তোমার উপর আর কীই-বা দুঃখ নির্যাতন এসেছে) তোমাদের পূর্বকার ঈমানদার লোকদের অবস্থা ছিল এই যে, তাদের কারো জন্য গর্ত খোঁড়া এবং সে গর্তের মধ্যে তার দেহের অর্ধেক পুঁতে তাকে দাঁড় করিয়ে তার মাথার উপর করাত দিয়ে তাকে দ্বিখন্ডিত করে ফেলা হতো। কিন্তু এ অমানুষিক অত্যাচার তাকে তার দ্বীন থেকে বিরত রাখতে পারতো না। আবার কারো শরীর থেকে লোহার চিরুনি দিয়ে আঁচড়িয়ে হাড় থেকে গোশত আলাদা করে ফেলা হতো। কিন্তু এতেও তাকে তার দ্বীন থেকে ফিরাতে পারতো না। আল্লাহর কসম এ দ্বীন অবশ্যই পূর্ণতা লাভ করবে। তখন যে কোনো উষ্ট্রারোহী সান’আ থেকে হায়রামাউত পর্যন্ত দীর্ঘ পথ নিরাপদে সফর করবে আর এ দীর্ঘ সফরে সে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করবে না এবং (মালিক তার) মেষ পালের ব্যাপারে নেকড়ে ছাড়া (বাঘ) অন্য কারো ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা খুবই তাড়াহুড়া করেছো।” (বুখারী)

কোরআন সুন্নাহর এ আলোচনা থেকে একথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসই হচ্ছে বাতিল শক্তির পক্ষ থেকে যুলুম নির্যাতনের ইতিহাস। যারা বাতিলের সাথে Compromise করে অথবা Alternate কোন পথ খোঁজে, হয়তো বা আপাতত দৃষ্টিতে তারা সমস্যা এড়াতে পারে। কিন্তু এটা মোটেই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পথ নয়।

জামায়াত নিছক ক্ষমতার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার প্রবণতাও জামায়াতে নেতৃত্বদের নেই। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে ধারা-১৫ এর ২ নং এ বলা হয়েছে, সদস্যগণের (রুকনদের) সরাসরি গোপন ভোটে আমীরে জামায়াত তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত হবেন। অষ্টম অধ্যায়ে ‘নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়’-এর ধারা ৬৫-এর ১ নং এ বলা হয়েছে, জামায়াতের সকল সাংগঠনিক স্তরে যে কোনো দায়িত্বপূর্ণ পদে নির্বাচন কিংবা নিযুক্তিকালে ব্যক্তির দ্বিনি ইলম, আল্লাহ ভীতি, আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, রাসূল (সা)-এর প্রতি আনুগত্য, দেশপ্রেম, আমানতদারি, অনড় মনোবল, কর্মে দৃঢ়তা, দূরদৃষ্টি, বিশ্লেষণ শক্তি, উদ্ভাবনী শক্তি, প্রশান্ত চিন্তা, সুন্দর ব্যবহার, মেজাজের ভারসাম্য, সাংগঠনিক প্রজ্ঞা ও সাংগঠনিক শৃঙ্খলার বিধানের যোগ্যতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হইবে। ২ নং এ বলা হয়েছে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো পদের জন্য আকাঙ্ক্ষিত হওয়া বা ইহার জন্য চেষ্টা করা উক্ত পদে নির্বাচিত বা নিযুক্ত হওয়ার জন্য অযোগ্যতা বলিয়া বিবেচিত।

গঠনতন্ত্রের এই ধারাসমূহ সংগঠনের সর্বত্র খুবই কঠোরভাবে Practice করা হয়। জামায়াতে ইসলামীতে কেউ নেতা হওয়ার জন্য যেমন আসে না তেমনিভাবে নেতৃত্ব আঁকড়েও থাকে না। জামায়াতের নেতাদেরকে নেতা না বলে দায়িত্বশীল বলার রেওয়াজ আছে। দায়িত্ব আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে। এ দায়িত্ব যেমন চেয়ে নেয়া যায় না তেমনি এ দায়িত্ব থেকে পলায়ন করার সুযোগও নেই। আজকে জামায়াতে ইসলামীর যে সমস্ত নেতা জেলে আছেন তারা কেউই ব্যক্তিগত কারণে জেলখানায় আবদ্ধ নন। ব্যক্তি জীবনে সৎ, যোগ্য এবং নীতিবান বলে তারা সমাজে পরিচিত। কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে আজ তারা জেল যুলুমের মত কষ্ট ভোগ করছেন। এদের কেউ কেউ মন্ত্রীও ছিলেন। মন্ত্রী থাকালীন সময়ে সততা যোগ্যতার পথে তারা দায়িত্ব পালন করেছেন। এর সাক্ষী যেমন মন্ত্রণালয়গুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তেমনি সাক্ষী দেশবাসী। দূরবীন দিয়ে খুঁজেও তাদের দুর্নীতি বের করতে কেউ পারেনি। তাহলে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার প্রশ্ন কেন আসে। কেউ দুনিয়াতে ক্ষমতাবান হওয়ার জন্য জামায়াতে ইসলামী করে না, করে আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতে মুক্তির লক্ষ্যে। স্বহস্তে কষ্টোপার্জিত অর্থ বায়তুলমালে দিয়ে এ সংগঠনের জনশক্তি সংগঠনের Fund-কে সমৃদ্ধ করে। (ষষ্ঠ অধ্যায় : ধারা-৬০)।

উল্লেখ্য, প্রত্যেক রুকন (সদস্য) নিজ নিজ মাসিক আয়ের কমপক্ষে শতকরা পাঁচ ভাগ এয়ানত হিসেবে প্রদান করে। জামায়াতের জনশক্তি বিশ্বাস করে: “যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের জান এবং মাল বেহেশতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন।” কাজেই সাধ্যমত তারা জানমাল দিয়ে আল্লাহর দ্বীন কায়েমে অংশ নেয়।

জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্ব নির্বাচনের দায়িত্ব কোনো নেতার নয়। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী রুকনদের প্রত্যক্ষ গোপন ভোটে আমীর নির্বাচিত হন। কাজেই এখানে কোনো New Generation-এর হাতে নেতৃত্ব ছেড়ে দেয়ার বা ধরে রাখার প্রশ্ন অবাস্তব।

বর্তমানে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আছে। যদি এ সরকার তার মেয়াদ পূর্ণ করতে পারে তাহলে আরও তিন বছর ক্ষমতায় থাকবে। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা (?) নিয়ে তারা ক্ষমতায় এসেছে। ক্ষমতার দাপটে তারা জামায়াত নেতৃবৃন্দকে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে আটক রেখেছে। কারও বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করলেই কি তাকে আটক রাখা যায়? এটা তো সুস্পষ্ট মানবাধিকার লঙ্ঘন। অভিযোগ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত একজন মানুষ নিরপরাধ। এটাই আইনের কথা। দীর্ঘ সাত মাস আটকে রাখার পরও এখন পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে তদন্তকারী সংস্থা কোন অভিযোগ গঠন করতে পারেনি। যেখানেই তারা তদন্ত করতে গেছে সেখানেই তারা গণপ্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে। আর এদের অনেকেই একাধিকবার এলাকা থেকে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। দলটির আমীর ২ বার তার এলাকা থেকে এমপি নির্বাচিত হয়েছেন। মোট ৪ বার তিনি নির্বাচিত করেছেন। বাকি দুইবার তিনি বিপুল ভোট পেয়েছেন ষড়যন্ত্র করে তাকে হারানো হয়েছে, তার বিরুদ্ধে কোথাও কোনো থানায় কোনো মামলা নেই। তার সততা, যোগ্যতার ব্যাপারে বিরোধী শিবিরেরও দ্বিমত নেই। শুধু আদর্শগত কারণে তারা এ রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার। বর্তমান সরকার ক্ষমতার দাপটে অনেক কিছুই করতে পারে। কিন্তু জামায়াতে ইসলামীর সর্বপর্যায়ের জনশক্তি (নেতৃবৃন্দসহ) বিশ্বাস করে: “আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর, আর সবকিছু আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে।” (আলে ইমরান-১০৯)

“বলুন, হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান করো এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য কেড়ে নাও। যাকে ইচ্ছা তুমি সম্মান দান করো আর যাকে ইচ্ছা অপমানিত করো। যাবতীয় কল্যাণ তোমারই হাতে। নিশ্চয়ই তুমি সকল বিষয়ে ক্ষমতাশীল। তুমিই রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দাও। আর তুমিই মৃত থেকে জীবিতদের আবির্ভাব ঘটানো। আর তুমি যাকে ইচ্ছা অপরিসীম জীবিকা দান করো।” (আলে ইমরান-২৬-২৭)

অসীম ক্ষমতার মালিক আল্লাহর কাছে দুনিয়ার সব ক্ষমতাই নগন্য। যারা আল্লাহর পথে চলে তাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। ১৯৭১ সালে জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক মতপার্থক্য ছিল। কিন্তু খুন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগের মত মানবতা বিরোধী কোনো

কর্মকান্ডেই তারা ছিলেন না। যদি থাকতেন তাহলে এ ৪০ বছরে এ দেশে তারা টিকতে পারতেন না। বরং চরিত্র মানুষের বদলায় না। ক্ষমতাসীন দলের সোনার ছেলেদের কর্মকান্ডে দেশের মানুষ আজ দিশাহারা। আজ যে চরিত্রের প্রকাশ তারা ঘটছে, তাতে ভাবতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, যে অতীতেও এসব কর্মকান্ডের নায়ক ছিল তারাই।

জামায়াতের নেতৃবৃন্দের নামে অপপ্রচার চালিয়ে তাদের ভাবমূর্তি নষ্ট করা এত সহজ নয়। তারা এদেশেরই মানুষ। এদেশের নাগরিক। রাজনৈতিক মতবিরোধ কোনো দলের থাকতেই পারে। কিন্তু যেদিন থেকে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে সেই মুহূর্ত থেকে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। এদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য জানমাল দিয়ে কাজ করাকে জামায়াতে ইসলামীর জনশক্তি ঈমানী দায়িত্ব মনে করে। আন্দোলন সংগ্রামের সময় অনেক দলেই দেখা যায় পয়সা নেই তো কর্মী নেই। কিন্তু সবাই জানে জামায়াতের ব্যতিক্রম। গাটের পয়সা খরচ করে তারা হকের জন্য মাঠে ময়দানে সব সময় সক্রিয়। সৎ নেতৃত্বের কথা বলে বুদ্ধিজীবীরা মুখে ফেনা তুলে ফেলেন। জামায়াত এই সৎ নেতৃত্ব তৈরি করতে জানে। যারাই জামায়াতকে কাছ থেকে দেখেছেন তারাই একথা স্বীকার করবেন। কাজেই জামায়াত নেতৃবৃন্দের ভাবমূর্তি নষ্ট করা এত সহজ নয়। এটা মানুষের অন্তরে গভীরে প্রোথিত।

অতীতে যারা ইসলামী আন্দোলন করেছে (আমি আগেই বলেছি) তাদের উপরও বিভিন্ন মিথ্যা দোষারোপ করা হয়েছে। আল্লাহ পাকের বাণী:

“দুনিয়ার এ জিন্দেগী একটা খেলতামাশার ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে পরকালের আবাস পরহেজগারদের জন্য উত্তম। তবে কি তোমরা বুঝ না? আমার জানা আছে যে, তাদের (কাফেরদের) উক্তি (হে নবী) আপনাকে অবশ্যই কষ্ট দেয়। কিন্তু তারা তো আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে না। বরং জালেমরা তো আল্লাহর আদালতকেই অস্বীকার করে। আপনার পূর্বে অনেক রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে। কিন্তু তাদের মিথ্যাবাদী বলা ও কষ্ট দেয়া সত্ত্বেও তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। অতঃপর আমার সাহায্য এসে পৌঁছেছে। আল্লাহর বাণী কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। আপনার কাছে পূর্বের নবীদের কাহিনী পৌঁছেছে। তা সত্ত্বেও যদি তাদের অনাগ্রহ ও উপেক্ষা আপনার সহ্য করা কষ্টকর হয়, তাহলে আপনি পারলে ভূতলে কোন সুদৃঙ্গ অথবা আকাশে সিঁড়ি তালশা করুন এবং তাদের নিকট কোন মোজেজা আনুন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে সবাইকে একত্রিত করে হেদায়েত করতে পারতেন। অতএব আপনি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।”

(আল আনয়াম ১৩২-১৩৫)

জামায়াতে ইসলামী যারা করে তারা জেনে বুঝেই করে। কোন আশংকা কোনো ভয় তাদেরকে ভিন্ন পথে চালিত করতে পারে না। মৃত্যু ভয়ও তাদের থাকে না। তারা জানে: “আল্লাহর পথে যারা শহীদ হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত।”

৫৮ | কামারুজ্জামানের চিঠি এবং জামায়াতের সংস্কার প্রসঙ্গ

এ দলের প্রতিষ্ঠাতা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী (র) ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, “আমি ক্ষমা কেন চাইবো? এ জন্যে কি যে, হে আল্লাহ তুমি আমাকে জান্নাতে পাঠিও না।”

দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবন শেষে চিরস্থায়ী আবাস জান্নাতে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় যারা জিহাদ ফি সাবিলিল্লায় অংশ নিল তাদের চিন্তায় কোন বিকল্প পথ নেই। এটা সেই পথ যা সরাসরি জান্নাতে চলে গেছে। পরম নিশ্চিততার সাথে এরা পথ চলে। জেল জুলুম কোন কিছুই তাদেরকে বিচলিত করে না। ইসলাম রক্ষার দায়িত্ব মানুষের নয় আল্লাহর। কাজেই তার নির্দেশিত পথে চলাই প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার দাবি।

বিবেচনায় আনতে হবে সবকিছু* শামসুন্নাহার নিজামী

দ্বিতীয় পর্ব

আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের মাধ্যমে মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্বের অবসান ঘটানোর লক্ষ্য বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কাজ করে যাচ্ছে। এ কাজ কোনো মনগড়া বা আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে জামায়াতে ইসলামী নির্ধারণ করেনি। বরং কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ কাজের কথা পরিষ্কার করে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে তৈরি করেছেন এ দায়িত্ব পালনের জন্য। যা কুরআনে কালামে পাকে আল্লাহ বলেছেন, “আমি দুনিয়াতে আমার প্রতিনিধি পাঠাব।”

এই প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন, ফেরেশতাদেরকে দেননি। ফেরেশতার আলাহর কর্মচারী। আল্লাহ যে হুকুম তাদের দেন তার বাইরে কিছু করার ক্ষমতা বা ইখতিয়ার আল্লাহ তাদেরকে দেননি। কিন্তু মানুষকে এ ক্ষমতা আল্লাহ দিয়েছেন। এ দায়িত্ব পালনের জন্য যুগে যুগে নবী-রসূল পাঠিয়েছেন। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) মানবতার Perfect Model।

যেহেতু এ কাজের জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাই এ কাজ মানুষের জন্য ফরজ। দুনিয়ার মানুষের সকল রকমের অশান্তি ও বিপর্যয় থেকে বাঁচানোর এটাই একমাত্র পথ। মানুষকে জুলুম-নির্ধাতন ও যাবতীয় শোষণ থেকে মুক্তিদানের জন্য আশ্বিয়ায়ে কেলাম (আ) কাজ করেছেন। মানুষ মানুষের দাস হবে না। সবাই একমাত্র আল্লাহর হুকুম মেনে চলবে। দাসত্ব বন্দেগী করবে একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ পাক বলেছেন, “হে মানুষ আল্লাহর দাসত্ব স্বীকার কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই।” (সূরা হুদ-৮৪)

* লেখক বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মহিলা বিভাগের সেক্রেটারি। কামারঞ্জামানের চিঠি নিয়ে পত্রপত্রিকায় রিপোর্ট ছাপা হওয়ার পর চিঠির জবাব হিসেবে দুই পর্বে সাপ্তাহিক সোনার বাংলায় এই লেখাটি প্রকাশিত হয়। লিংক: দ্বিতীয় পর্ব (২৫ মার্চ ২০১১): weeklysonarbangla.net/news_details.php?newsid=922

“আল্লাহই তোমাদের রব। সন্দেহ নেই, তিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্র সবকিছুই তার নিয়ন্ত্রণাধীন। সাবধান সৃষ্টিও তাঁর, প্রভুত্বও তাঁর।” (সূরা আরাফ-৫৪)

“তিনিই আল্লাহ, তিনিই তোমাদের রব। তিনি ছাড়া আর কোন রব নেই। তিনিই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা।” (সূরা আনয়াম-১০২)

“তাদেরকে সবকিছু ছেড়ে, সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব স্বীকার করা এবং তারই আনুগত্য করে চলার আদেশ করা হয়েছে মাত্র।” (সূরা আল বাইয়েনাহ-৫)

নবী-রসূলগণের মাধ্যমে আল্লাহপাক যে জীবনবিধান পাঠিয়েছেন তার মূল কথাই হলো, আইন রচনা, নির্দেশ দান ও বিধান প্রণয়নের কোন অধিকার মানুষের নেই। এ অধিকার একমাত্র আল্লাহর।

“আল্লাহ ছাড়া আর কারো নির্দেশ দান ও আইন রচনার অধিকার নেই। তাঁর আদেশ এই যে, আল্লাহ ছাড়া কারো বন্দেগী বা দাসত্ব কবুল করো না। বস্তুত এটাই সঠিক ও নির্ভুল জীবনব্যবস্থা।” (সূরা ইউসুফ-৪০)

“লোকেরা জিজ্ঞাসা করে, কর্তৃত্বে আমাদেরও কোনো অংশ আছে কি? বল হে মুহম্মদ (সা), অধিকার ও কর্তৃত্বের সবটুকুই আল্লাহর জন্য নির্ধারিত।” (সূরা আলে ইমরান-১৫৪)

“আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুযায়ী যারা আইন রচনা করে না, হুকুম পরিচালনা করে না, মূলত তারাই যালেম।” (সূরা আল মায়েরা-৪৫)

আইন রচনা করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। এ অধিকার কোন মানুষের নেই এমনকি নবীদেরও নেই। নবী নিজেও একমাত্র আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলেন।

“আমার নিকট যে অহী নাযিল হয়, আমি কেবল তারই অনুসরণ করে চলি।” (সূরা আল আনয়াম-৫০)

নবীর অনুসরণ করা ছাড়া আল্লাহর হুকুম পালনও সম্ভব নয়।

“আমি যখনই কোনো রাসূল প্রেরণ করেছি, আল্লাহর অনুমতি অনুসারে তাঁর অনুসরণ করার জন্য তাকে পাঠিয়েছি।” (সূরা নিসা-৬৩)

কুরআনের এ আয়াতগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারি কোনো ব্যক্তি, বংশ পরিবার, শ্রেণী বা দল, এমনকি রাষ্ট্রও প্রভুত্বের অধিকারী নয়।

আইন রচনা ও বিধান প্রণয়নের অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। আল্লাহর দেয়া আইনের কোনোরূপ পরিবর্তন বা সংশোধন করার অধিকারও কারও নেই।

আল্লাহপাক নবী (সা) এর মাধ্যমে যে বিধান দুনিয়ায় পেশ করেছেন তাই ইসলামী রাষ্ট্রের চিরন্তন ভিত্তিগত আইন। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যও আল্লাহপাক নির্ধারণ করে দিয়েছেন:

“আমি আমার নবীদেরকে সুস্পষ্ট বিধানসহ প্রেরণ করেছি। কিতাব ও ‘মিযান’ তাদেরকে আমি দান করেছি। এর সাহায্যে মানুষ সুবিচার ও ইনসারফ কায়েম করতে পারবে। আমি ‘লৌহ’ও দিয়েছি। এতে বিরাট শক্তি ও মানবতার অশেষ কল্যাণ নিহিত রয়েছে।” (হাদীদ-২৫)

এ আয়াতে ‘মিযান’ শব্দটিতে সঠিক ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থার কথা বোঝানো হয়েছে। এ অনুযায়ী সমাজে সামাজিক সুবিচার কায়েমই এর লক্ষ্য, যা ছিল আশ্বিয়ায়ে কেরামের একমাত্র কাজ।

“এদেরকে আমি যদি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা এবং রাজশক্তি দান করি তাহলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে, ভাল ও কল্যাণকর কাজ করবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে।” (সূরা আল হাঙ্ক-৪১)

“তোমরা সবচেয়ে উত্তম জাতি, নিখিল মানুষের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দিবে, অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে।” (সূরা আলে ইমরান-১১০)

কুরআনে কালামে পাকের এ আয়াতগুলো থেকে একথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্য শুধু মানুষকে জুলুম-নিপীড়ন থেকে মুক্তি দেয়া ও দেশকে বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষা করাই নয় বরং কুরআন অনুযায়ী সামাজিক সুবিচারের সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পাপ কাজের সমস্ত উৎস বন্ধ করা এবং পুণ্য ও কল্যাণের সমস্ত পথ খুলে দেয়া। সমাজ ও সংস্কৃতির প্রত্যেকটি দিক ও বিভাগকে এটি স্বীয় বিশিষ্ট নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সংস্কারমূলক কর্মসূচি অনুযায়ী গঠন করে। অর্থাৎ মানুষের গোটা জীবনকে এর প্রভাবাধীন করে নেয় এবং এ ধরনের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধান আল্লাহ ছাড়া আর কারও পক্ষেই দেয়া সম্ভব নয়। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রের ভূমিকায় এ কথাগুলো পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

মূলত বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী প্রচলিত অর্থে কোনো রাজনৈতিক দল নয়। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন। কুরআন এবং সুন্নাহর আলোকে এবং নির্দিষ্ট গঠনতন্ত্রের মাধ্যমে এ দল পরিচালিত হয়। বিরোধী কোন শক্তির পক্ষ থেকে কেউ আক্রমণ করল কিনা তার মোটেও পরোয়া করে না জামায়াতে ইসলামী। অতীতে নবী-রাসূলগণও এ পরোয়া করেননি। বরং তাদের অবস্থা এমন ছিল যেন মৌচাকে টিল মেরে

সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকা, যেন সমস্ত মৌমাছিকে আক্রমণ করার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো। এ কাজ সবার পক্ষে করা সম্ভব নয়। যারা এ উদ্দেশ্যকে নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে তারাই এ কাজের উপযুক্ত। এ আন্দোলনের কর্মী বা নেতা হলেই চলবে না বরং এর আদর্শের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। তাদেরকে হতে হবে কুরআন সুন্নাহর অন্তর্নিহিত ভাবধারা এবং এর খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ। এ ব্যাপারে কোন বিশিষ্ট নাগরিক, প্রবীণ আলেম বা পন্ডিত ব্যক্তির প্রাধান্য দেওয়া যাবে না।

ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর এবং আইন রচনার অধিকারও একমাত্র আল্লাহর। যারা এ আদর্শ প্রতিষ্ঠার কাজ করে তারা আল্লাহর প্রতিনিধি বা ‘খলিফা’।

“তোমাদের মধ্যে ঈমানদার ও সেই অনুযায়ী সৎ কর্মশীল লোকদের নিকট আল্লাহ এ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদেরকে দুনিয়াতে খলিফা বা প্রতিনিধি নিয়োগ করবেন। তাদের পূর্ববর্তী লোকদের যেরূপ এই মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল।” (সূরা আল নূর-৫৫)

এ জন্য প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্বশীল। এ প্রতিনিধিত্ব কোন বিশেষ ব্যক্তি, বংশ বা গোত্রের জন্য নির্দিষ্ট বা সুরক্ষিত নয়। নবী করিম (সা) বলেছেন:

“তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই আল্লাহর নিকট নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।”

ইসলামী সমাজে শ্রেণীবিভেদ, জন্মগত বা সামাজিক বৈষম্য ও পার্থক্যের বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। সব মানুষই সমান মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী। অবশ্য ব্যক্তিগত যোগ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে কারও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হতে পারে। রাসূল (সা) এর হাদীস:

“কারো উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব বা বৈশিষ্ট্য নেই। তা প্রতিপন্ন হতে পারে একমাত্র দ্বীন ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞান, কর্ম ও তাকওয়ার কমবেশির কারণেই। সব মানুষই আদমের সন্তান। আর আদম মাটি হতে সৃষ্ট। আরববাসীর অনারবদের উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। অনারবদেরও কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই আরববাসীর ওপর। তেমনি শ্বেতাঙ্গদের কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর এবং কৃষ্ণাঙ্গদের শ্বেতাঙ্গদের ওপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব বা বৈশিষ্ট্য নেই। কারও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার হতে পারে একমাত্র তাকওয়ার কারণে।”

মক্কা বিজয়ের ফলে সমস্ত আরব দেশ ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হলে মহানবী (সা) কুরাইশদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন:

“হে কুরাইশগণ! আল্লাহ তোমাদের অন্ধকার যুগের গৌরব অহঙ্কার এবং বংশীয় আভিজাত্য দূর করে দিয়েছেন। হে মানুষ তোমরা সকলেই আদমের সন্তান। আর আদম তৈরি মাটি থেকে। বংশীয় গৌরবের কোনো সুযোগ নেই। আরবদের ওপর অনারবদের

এবং অনারবদের ওপর আরবদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুত্তাকী ব্যক্তিই বেশি সম্মানিত।”

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাচিত হবে— “তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আল্লাহভীরু ব্যক্তিই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত।” (সূরা হুজুরাত-১৩) – এই মূলনীতি অনুযায়ী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্ব নির্বাচিত হয়ে থাকে। (বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্র: অষ্টম অধ্যায়: ধারা ৬৫)

আমীর সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। সকল মুসলমানই তার সমালোচনা করতে পারবে। এমনকি তার ব্যক্তি জীবন সম্পর্কেও সমালোচনা করার অধিকার সবার আছে। প্রয়োজনে আমীরকে পদচ্যুতও করা যাবে। (গঠনতন্ত্র: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ধারা-১৭)

আমীর পরামর্শ করে কাজ করবেন। সে জন্য একটি মজলিশে শূরা বা পার্লামেন্ট গঠন করবে। মজলিসে শূরার প্রতি জনগণের অবিচল আস্থা থাকতে হবে। (গঠনতন্ত্র: ধারা-১৮)

শূরার ফয়সালা সাধারণত সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতেই হবে। কিন্তু ইসলাম সংখ্যাধিক্যকে সত্যের মাপকাঠি বলে স্বীকার করে না।

“পংকিল-কদর্য ও পবিত্র— এ দুটো জিনিস কখনো সমান হতে পারে না। পংকিলের সংখ্যাধিক্য তোমাকে স্তম্ভিত করে দিলেও নয়।” (আল মায়েরা-১০০)

এক ব্যক্তির কোনো রায় গোটা মজলিসে শূরার বিপরীত হলেও তা সত্য ও সঠিক হতে পারে। ইসলামে তার পূর্ণ অবকাশ আছে। কাজেই কুরআন সুল্লাহ মাফিক আমীর ফয়সালা করবেন। এ ব্যাপারে আমীরের তাকওয়া, আল্লাহ ভীতি, আমানতদারী, দূরদৃষ্টি ইত্যাদির দিকে জনগণ খেয়াল রাখবেন। যদি এর ব্যতিক্রম হয় তাহলে আমীরের পদচ্যুতির ব্যাপারে কোন বাধা থাকবে না।

মূলত ইসলামী রাষ্ট্রের পূর্ণাঙ্গ চিত্র, এর কর্মপদ্ধতি ইত্যাদি আমরা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর জীবনী এবং খোলাফায়ে রাশেদার ইতিহাস থেকে পাই। আমাদেরকে সত্যিকার কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে হলে; দেশ, জাতি ও জনগণের প্রকৃত কল্যাণ মঙ্গল চাইলে— এগুলো গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে। কোনো ভাসা ভাসা জ্ঞান নিয়ে এ বিরাট কাজ সম্ভব নয়। সর্বোপরি ব্যক্তিজীবনে আদর্শের Perfect অনুসারী হতে হবে। মনে রাখতে হবে কুরআনের এ শাস্ত বাণী:

“আর মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি অথচ তারা আদৌ ঈমানদার নয়। তারা আল্লাহ ও ঈমানদারদেরকে ধোঁকা দেয়। অথচ তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না। অথচ তারা তা

অনুভব করতে পারে না তাদের অন্তরে ব্যাধি আছে আর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। বস্তুত তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে ভয়াবহ আযাব, তাদের মিথ্যাচারের দরুন। আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, দুনিয়ার বুকো দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করো না। তখন তারা বলে, আমরাই তো শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী। মনে রেখো তারাই শান্তি ভঙ্গকারী। কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করতে পারে না। আর যখন তাদের বলা হয়, অন্যরা যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে ঈমান আনো। তখন তারা বলে, আমরাও কি বোকাদের মতো ঈমান আনবো? মনে রেখো প্রকৃতপক্ষে তারাই বোকা। কিন্তু তারা তা বুঝতে পারে না।” (সূরা বাকারা)

“আর মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যাদের পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করবে। আর তারা সাক্ষ্য স্থাপন করে আল্লাহকে নিজের মনের কথার ব্যাপারে।” (সূরা বাকারা)

“আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবি করে যে, যা আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছি। অথচ তারা তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থী হতে চায়, যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়।” (সূরা নিসা)

“মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর ইবাদত করে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সাথে। যদি সে কল্যাণপ্রাপ্ত হয় তবে এবাদতের উপর কায়ম থাকে এবং যদি কোনো পরীক্ষায় পড়ে তবে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ইহকালে ও পরকালে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।” (সূরা হজ্জ-১১)

Do Islamists need a way out?*

Part-I

Shah Abdul Halim

I attended an international workshop on ‘Politics and Islam’ in Islamabad that was organized by Henry L. Stimson Center, a Washington based U.S. Think Tank. Diaa Rashwan, Director of Al Ahram Center for Political Strategic Studies Egypt attended the event. We had a good discussion on the political situation in Egypt and the activities of the Muslim Brotherhood in the sideline of the workshop. Diaa then informed me that Brotherhood is planning to float a new political party. The debate was then going on “*whether this prospective party will be a means for the Muslim Brotherhood to carry out its public and political work, or if it will replace the Brotherhood entirely*”.¹

Now in the backdrop of the downfall of President Hosni Mubarak, Brotherhood has floated a new political party – Freedom and Justice Party. The Muslim Brotherhood would however continue to operate as the parent organization.

What is the lesson Islamists in Bangladesh can draw from the Egyptian experience is a very pertinent question now hitting the mind of the political observers here. In Bangladesh the mainstream Islamist, the Bangladesh Jamaat-e-Islami, analysts say, has lost

* The Author is a researcher and Chairman of *Bangladesh Center for Islam and Pluralism*. This article is published in *The New Nation* on 13th July 2011 [www.thenewnationbd.com/newsdetails.aspx?newsid=10934]. It is also published in official website of *Ikhwanul Muslimun* [www.ikhwanweb.com/article.php?id=28791]

much of its creditability for opposing the liberation war of the country in 1971. Whether this analysis is right or wrong, the fact remains that the secular forces here have been quite successful to discredit Bangladesh Jamaat-e-Islami in the public eyes and have also been successful to poison the minds of the new generation of people against it. That being the scenario, many analysts consider Jamaat-e-Islami as a “*spent force*”.² It has hardly any future.

In this backdrop, a workshop was held in Dhaka in July 2009. It was participated by all former Presidents of Islami Chhattra Shibir, the student wing of Bangladesh Jamaat-e-Islami, three Assistant Secretary Generals of Bangladesh Jamaat-e-Islami, quite a few well-known lawyers, several retired government officials, eminent educationists and some other Islamist intellectuals.³ The main theme of the paper presented in Power Point was to float a new political party in the model of Turkish Justice and Development Party, otherwise known as A. K. Party with the avowed objectives of promoting public welfare, good governance, safeguarding the independence, sovereignty and territorial integrity of the country, besides protecting the nation’s economic interest, particularly safeguarding gas and other mineral resources.

Some people as back as April 1998 also had written to the top leadership of Jamaat to float a new party with liberal and democratic aims and objectives committed to establishing social justice, peace, stability and bringing prosperity to the nation. The workshop paper of July 2009 also recommended that the proposed party must distance itself from the demand of a theological state and strict compliance of shariah in public life.

The recommendation of not bringing shariah into politics came in the light of the recently carried out ijtihad or search on the application of shariah which says: “*Negus, the Emperor of Abyssinia, who embraced Islam but did not rule as per shariah as that would have threatened his Kingdom. ... From this it becomes clear that Muslims can rule without implementing shariah if the circumstances are not in their favor or the people are not ready for*

*such reform or the situation is not healthy enough or conducive for such a transformation or change”.*⁴

An Nahadah Party ideologue Sheikh Rachid Ghannouchi, in the backdrop of the recent change in Tunisia, has returned to the country from long exile in the United Kingdom and has declared that An Nahadah will not bring shariah into politics. Meanwhile Muhammad Kamaruzzaman, Senior Assistant Secretary General of Bangladesh Jamaat-e-Islami who is now in prison facing the charge of war crimes for alleged involvement in human rights violation during the liberation war has circulated a political discourse dated 26 November 2010 to a select group of top Jamaat leaders as to what strategy need to be adopted in the country's changed political environment. Its copy has been leaked to the press. Reformists within Jamaat have however widely circulated photocopies of this political advice among the Jamaat activists, followers and sympathizers and it is now in everybody's possession.

Kamaruzzaman in his political discourse has also advised Jamaat to form a new political platform with new policy and strategy outlines.⁵ In his paper Kamaruzzaman has given the outline of the proposed party. He suggested that Jamaat leaders against whom charges of war crimes hang should not be in any way linked with the new party. But many others believe this is perhaps not enough. Since the agenda of the Islamists should be the progress and advancement of Islam in society, the new party should be manned and headed by people from post-liberation generation, those who are born after 1971, against whom there cannot be any charge of war crimes or stigma of collaboration with the Pakistan army. The proposed party should even scrupulously avoid associating the family members or close relatives of pre-liberation Jamaat leaders in the new party. There should not be any illusion about this. No mental obsession should also be there though it may be painful.

It might appear to some as regression or a step back from Islamic call and guidance but it will ultimately pave the way for a stride and forward march creating a new environment where Islamic politics may make new leap forward. The proposed party should be

totally democratic in architecture. Centralize authority must be discarded in the new party.

The weakness of the Islamist movement is that although it believes in human equality in principle but it has failed to translate such equality in real life practice in the state and the society as a whole. Malaysian scholar Dr. Chandra Muzaffar rightly pointed out:

“If one looks at the contemporary situation, one could argue that contemporary Islamic movements have by and large, with a few exceptions such as the An Nahdah Party of Sheikh Rachid Ghannouchi, inherited this notion of equality and political, economic, social, and gender relations from the history ... It is a notion of equality which has been embodied in the fiqh tradition, the Islamic tradition of jurisprudence, which must be distinguished for the purpose of analysis from the divinely rooted shariah.

It is this fiqh tradition, which has formed the basis of Islamic movement’s approach to this fundamental question of equality in society. What Islamic movements have done the most notable amongst them being the Muslim Brotherhood and the Jamaat-e-Islami, is to say that they have accepted equality as an important principle at the general level. However, when it comes to translating that principle into specifics you will find that there are many inequalities and that they accept the inequality as divinely sanctioned. ... For example, in the realm of politics the fiqh oriented approach of contemporary Islamic movements is to say that you need a powerful ruler, a ruler who would centralize authority and thus be able to establish the norms and principles of an Islamic polity. That this in itself an act of inequality is something that does not occur to them. You will find that within these Islamic movements there is very little support for the idea of people’s participation and empowering the individuals. Rather there exists this notion of a strong leader at the apex of society.”⁶

The leadership structure of the proposed party should be built like a pyramid – bottom-up approach from grassroots to the center, instead of top-bottom approach, where the leader at the apex nominates rest of the leadership having the veto power to overrule

the decision of consultative committee and executive committee. In keeping with the true spirit and tradition of democracy, the new party would allow its members the unbridled freedom and opportunity to elect leadership and in no way restrict the exercise of the freedom to choose leadership by limiting their option by way of creating a panel of leadership, which only reflects the senior leader's lack of trust, faith and confidence on the ability of general members in exercising voting rights judiciously, from which top leaders are to be elected by the members.

The proposed party should adopt the system of electing leadership at every tier and the current belief and mindset of the Islamists that placing oneself to contest for leadership is contrary to the teachings of Islam must be given-up. History bears testimony that Prophet Yusuf (peace and blessings be upon him) asked Pharaoh to give him the ministerial responsibility of the government to administer the food management to ameliorate the suffering of the people. It means that if the Islamist leadership has any expertise, they are duty bound even today to offer their services for the common good, public wellbeing and social welfare and refusing to offer or give such service shall be tantamount to zulm or oppression.

Prophet Yusuf therefore did not hesitate to ask for ministerial responsibility to administer the food management and participate in the administration of Pharaoh to save people from starvation. The same principle should hold good and valid even now. What has happened to Prophet Yusuf can repeat to Muslims today. Muslims are permitted to ask for leadership position and join government to fulfill the greater interest of the Muslim community, the ummah and prevent evils and wrongdoings. Failure to do so will lead to undermining the overall interest of the Muslim community, the ummah and allowing the evils to spread and dominate the society. Muslims offer dua or prayers to God to give them leadership over the believers, muttaqina imama. So asking position for leadership cannot be termed as un-Islamic.⁷

The new party leadership must abide by the decisions of the shura or consultative committee. The decisions of the consultative

committee must be binding on the leader(s) at apex. King Abdul Aziz became a caliph, the fifth rightly guided caliph of Islam, by accepting the binding provision of the shura. After the state of Medina was established and the Prophet (peace and blessings be upon him), now head of the state, was then ordained by God:

“Consult them (the Companions) in the (community) affair(s), and when you have reached a decision, then place your trust in God (and implement it).” [Al Quran 3: 159]

“Al-Tabari characterizes consultation as one of the fundamental principles of the shariah (azaim al-ahkam), which are essential to the substance and identity of Islamic government. Ibn Taymiyyah held a similar view, observing that God, Most High, commanded the Prophet (peace and blessings be upon him) to consult the community, despite the fact that he was the recipient of divine revelation. The Quranic command is therefore all the more emphatic with regard to the subsequent generations of Muslims who no longer have the Prophet among them, and no longer have access to direct revelation. Muhammad Abduh has also held that in this verse, *consultation is not just a recommendation, but an obligatory command addressed primarily to the head of the state to ensure that it is properly implemented in the government affairs.*”⁸

It is thus evident that shura or consultation is obligatory for the leadership of the political party as they are directly involved with the process of governance of the state. The strength of the shura lies in the fact that consultation brings people closer together, and it provides them with an opportunity to share ideas and voice their views on matters of common concerns. In this way, shura prevents disunity and division among the people. But consultation can only be meaningful and effective when the participants enjoy total freedom to express their views. It would be totally in vain, and would make no sense to say that in Islam the government and for that matter political party is bound by the principle of consultation, and yet should have the liberty to deny the members of the shura the freedom to express an opinion.

It may not be out of context to mention here that Dr. Rezaul Karim, President of Islami Chhattra Shibir, working for the coterie of a section of former Islami Chhattra Shibir Presidents who consider them more wise and judicious over the collective consultation, refused to accept the decision of the shura in 2009 to nominate Shishir Muhammad Munir as the Secretary General of the student organization. It sparked crisis and caused resignation of 20 out of 34 executive committee members. Islami Chhattra Shibir must exercise unbridle freedom and independence as an organization and in no way be subservient to advice from any other person or organization. It must not involve people outside its own organization to mediate or resolve its problems rather must strictly follow its own constitutional provisions in resolving disputes, if ever it arises. Past experience has shown that mediators become partisan. Islami Chhattra Shibir in no way and must not become an organization of sycophant or what Muhammad Kamaruzzaman said:

Islami Chhattra Shibir must come out of the fold of 'lejurbritti' or sycophancy of any political organization.

In the new party women members should be an integral part of the shura. This will help male members of the shura to have perceptions and views of women on important gender issues along with other national and international subjects to reach a fair, judicious and balanced decision. If women shura or consultative committee is separate, the fact remains that their voice is not heard at the particular moment of taking vital decisions. In the past it has been seen that women parliamentarians and male parliamentarians of the Islamist party are sitting in the same room although the male and female shura members are sitting in separate rooms. These practices are self-contradictory having no logic. Sometimes women are suppressed and their voice is not heard. This is neither Islamic nor democratic.

Elections to form committees and choose leadership of the proposed party at all levels must be on the basis of open discussion, secret ballots and open counting. Counting party election results

openly and then declaring the scoring will not create division within the party as some argue; rather this will restore confidence in the rank and file of the new party. This would also meet the requirement of the national Election Commission. It would also break the hands of vicious circles who often manipulate the election results of the party as they do not consider shura binding. It is alleged that such manipulation did occur at different tiers of the student organization. It is also alleged that during party elections, election commissioner had even rigged and manipulated the results of apex body in the recent past.

The workshop held in July 2009 suggested that the proposed party should not be cadre based. The past experience has shown that cadre system develops privileged-class and a bar on the entry of newcomers to turn it into a mass organization. The leadership should be developed step by step from the grassroots. The cadre system would have no place at any level in the democratic setup of the new party.

The present reporting system on personal conduct which a member has to maintain, according to some insiders, has also proved mischievous and it must be discontinued in the proposed political party.

The system of whole-timer should also be discarded in the proposed party. Experience has shown that whole-timers, being totally dependent on the salary of the party, lose freedom and confidence to think independently being afraid of losing favor from the hierarchy where innovation and creativity constitute the lifeline of any organization committed to work for reform and renaissance. Whole-timers are found more interested in protecting their self-interest rather than working to push the right cause and chart out a pragmatic way as it may antagonize the party establishment.

The new party should be prepared to accept women in the leadership including the leadership positions at the apex. The Islamists are not yet ready to accept and embrace women in the leadership, which is another example of inequality between men and women. Those who object to assigning political positions to

women forget that in today's world rulers are only parts of a wider political establishment making the government.

Indeed government itself is one of a group of as many institutions that shares out among them the power and authority of the state, which were the domain and used to be exercised by a single ruler in the past, regardless of the title he assumed. During the earlier days of Islam the kholafa-e-rashadeen used to combine in them a whole range of comprehensive and broad authority, over the whole Muslim world which no ruler is expected to exercise now or in foreseeable future, including leading prayers, commanding armies, exercising absolute ijihad in fiqh besides exercising powers as the supreme judge. These are being performed now by many people at different levels. There is a strict bifurcation and separation of powers.

From the point of view of her competence, a woman may be now assigned some of these powers, including the post of the head of the state, because none of these powers, including that of head of the state, constitutes the overall authority over the community.⁹

The proposed party should have at least one woman Vice President and one woman Assistant Secretary General. The post of the President and the Secretary General should also remain open to contest by women. The Islamist in Bangladesh must take lessons from others. In Iran, which is no doubt an Islamic state, woman has been elected to the post of Vice President.

The new party as a matter of policy should adopt easy options when Islam offers different alternatives in resolving problems. It would always remain open to examine variable choices while deciding policy matters. Some Islamists overemphasize the importance of covering face by woman. A number of Islamist organizations have failed to make difference between local culture and Islamic culture, which is one of the reasons for the backwardness of the Muslims. Covering face of woman is a local culture and has nothing to do with Islam. Those who insist on using total veil by the women are really working to create bottleneck in the progress of Islamic society rather than promoting its advancement.¹⁰

Notes:

1. Diaa Rashwan, “Political Islamists Movements: The Case of the Muslim Brotherhood in Egypt” in *Islam and Politics: Renewal and Resistance in the Muslim World*, Stimson Regional Voices, Henry L. Stimson Center Washington, 2009, pp 3-16
2. Abid Ullah Jan, “Moderate Islam: A Product of American Extremism”, *American Journal of Islamic Social Sciences*, jointly published by Association of Muslim Social Scientists and International Institute of Islamic Thought, Herndon, VA, USA, Vol. 22, No. 3, Summer 2005, p 35.
3. *Weekly Budhbar*, 7 October 2009
4. Sheikh Rachid Ghannouchi, “The Participation of Islamists in Non-Islamic Government” in Azzam Tamimi ed. *Power-Sharing Islam, Liberty for Muslims*, World Publications, London, UK, 1993, pp 57-58. Also see Prof. Dr. Yusuf al Qaradawi, *Islamic Awakening between Rejection and Extremism*, IIIT, Virginia, USA, 1991, pp 137-138. Further see Shah Abdul Halim, *Concept of Sovereignty and Other Issues*, www.shahfoundationbd.org
5. Daily Kalerkantho, 28 February 2011
6. Shah Abdul Halim, *Islamic Movement: An Overview*, www.shahfoundationbd.org.
7. Shah Abdul Halim, *Power Sharing in Islam*, www.shahfoundationbd.org
8. Mohammad Hashim Kamali, *Freedom of Expression in Islam*, Part Two, Chapter IV Consultation (Shura), Ilmiah Publishers Sdn Bhd, Kuala Lumpur, 1998, pp 40-44
9. For a detailed discussion as to whether women leadership is allowed in Islam or not see Shah Abdul Halim, *Can Woman Become Head of the State or Government*, www.shahfoundationbd.org
10. This position of not covering face by women is also shared by Dr. Ahmad Totonji. See Shah Abdul Halim, *Totonji on the Backwardness of the Muslim Ummah*. www.shahfoundationbd.org

Do Islamists need a way out?*

Part-II

Shah Abdul Halim

Veil Issue

Eminent Egyptian Islamic scholar Sheikh Adil Salahi commenting on the verses 24:30-31 [*Say to the believing men that they should lower their gaze ... And say to the believing women that they should lower their gaze ...* Al Quran 24:30-31] wherein both men and women have been asked to lower their look when fall on the opposite sex, in his regular weekly column 'Our Dialogue' in Saudi daily Arab News observed:

“The instruction of the verses quoted above is that both men and women are required to keep their eyes cast down, so that when they meet each other, neither should men stare at women nor women at men. The natural question that arises is why man should lower his gaze if the face of woman is totally covered? From the text of the verses it is clearly evident that the face of the woman is not to be covered and therefore man has been advised to lower his look”.

Muslim Brotherhood leader Abdul Halim Abu Shuqqah commenting on the aforementioned verses said that the intent of the Law Giver is that women need not cover face. He said that if the intention of the Law Giver was to cover the face of women than He would not have asked men to lower the gaze.¹

* This article is published in *The New Nation* on 22nd July 2011
[www.thenewnationbd.com/newsdetails.aspx?newsid=11748]

The Islamists in Bangladesh should take note of the general practice of hijab by women in Indonesia, Malaysia, Iraq, Palestine, Lebanon, Egypt and Morocco where they keep their face open and they do not cover face with niqab. Women in the Saudi Television also appear without niqab or without covering the face. Even the women leaders of Muslim Brotherhood throughout Middle East, including eminent Brotherhood leader of Egypt Zainab al Ghazali known for her monumental work “*Return of the Pharoah: Memoirs in Naser’s Prison*”, do not cover their face. It is obligatory that women must not cover their face during hajj.

Proposed Leadership Structure, new parameters and Delegation

Kamaruzzaman’s initiative also called for *limiting the tenure of the office of the central president and district presidents of the new party. He proposed to limit the tenure of the central president and the district presidents to three terms.* But it would be appropriate to limit the tenure to two consecutive terms of three years each. To bring dynamism in the party, a system may be developed by which leadership is rotated through secret credible elections. Unlike the prevailing practice of the Islamists, at least fifteen posts of vice president and twenty-five posts of assistant secretary general may be created in the proposed party. This would create opportunity to produce more leaders, built up their capacity; evaluate who is more capable and dynamic in sharing responsibility.

The central leadership structure of the proposed party however may be organized based on how many people it wants to put in the various watchdog committees and in the Shadow Cabinet. This issue will be discussed at the later part of this article. Those found effective at the grassroots, particularly whose performance at the local government elections would be highly impressive and people would accept them as public leaders, should be gradually elevated to the central leadership.

However highly skilled professionals, eminent educationists, senior retired civil and military bureaucrats, celebrated journalists, renowned lawyers, prominent political leaders of other parties and

such other notable members of the civil society with secular background, if they accept the aims and objectives and join the new party, should be elevated to the higher echelon of the leadership in keeping with the practice of the noble Prophet who had placed leaders of the days of jahiliyyah or ignorance, when they sincerely accepted Islam and joined the Muslim rank, in the leadership ranks.

In other words persons with rich and highly potential background will be absorbed in the new party implementing the spirit of the saying of the Prophet Muhammad: *khia rukum fil jahiliyyah khia rukum fil Islam* which means - those who proved competent in leadership during the days of jahiliyyah or ignorance they proved equally competent in leadership when they had joined the rank of Islam.

The proposed party will use standard parameters to evaluate the performances of the leadership and their ability to turn the party into a mass organization and effectively run a modern democratic state. Such parameters shall also be used to ascertain the intellectual capacity of the leadership in the context of the changed global environment. While developing such parameters, due consideration shall be given to such factors as professional skill, educational background, intellectual capacity, moral and ethical moorings and more importantly behavioral pattern etc.

The new party will also use parameters to make sure that leadership upholds high standard of financial integrity and maintains transparency in all fairness in fund management and monetary transactions. The leadership should also be required to make it certain that their living expenses and increase in wealth and all types of resources should commensurate with the known sources of earnings.

Past experience shows that concentration of power and responsibility without accountability in few hands make such persons over influential and sometimes quite despotic as the saying goes power makes a man corrupt and absolute power makes a man absolutely corrupt. Power intoxicates best hearts as the wine intoxicates the strongest heads. No man is wise enough or good

enough to be trusted with unlimited power. Such concentration of power and responsibility is a bar on the development of collective leadership of participatory nature. By delegating power only in few hands the leadership at the apex in fact creates a situation in which the prospect of producing a galaxy of leaders, who can handle critical situation, might diminish.

The leadership qualities never can be developed unless workload and responsibility are delegated. It is evident from the actual situation within the country's Islamist organization that the so-called trustworthy leaders at the zenith of the party, who consider themselves the only capable persons and indispensable have in fact developed a sort of bureaucratic mindset. They believe that without them the organization will not be able to sustain and they, in fact, have monopolized power by turning them into a vested group to protect their interests. Some people believe that these few leaders at the top have aggrandized power and position overlooking the greater community interest.

The proposed party should not allow a person to hold more than one position at a time as was advised by some people in some occasions in July 1996 and April 1998 and now by Muhammad Kamaruzzaman. It needs to be realized that human capacity is limited and at one point it gets saturated. Moreover those who are overburdened with too many jobs may not concentrate on any work or go into details of any issue. Thus the work suffers.

Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him) during his life time sent Muadh b. Jabal (may God be pleased with him) as Governor to Yemen. *On being asked by the Prophet as to how he will govern, Muadh b. Jabal replied that he will govern according to the Quran and will refer to sunnah if clear instruction is not available in the Quran and then will exercise his individual judgment if an explicit injunction is neither available in the Quran nor in the sunnah.* History bears the testimony that Prophet Muhammad endorsed the governing principle and procedure of Muadh b. Jabal. Prophet even authorized Amr b. al-As (may God

be pleased with him) to adjudicate in some disputes in his presence.²

From this, analysts conclude that ijhtihad or intellectual exercise is allowed in Islam and ijhtihad is the Sunnah of the Prophet. But what escaped the attention of many scholars and leaders of Islamic call and guidance is that Prophet Muhammad during his life time had delegated powers to Muadh b. Jabal and Amr b. al-As.³ This delegation is the pivotal precept of Islam and democracy. Unless you delegate, you really suffocate. Nothing can flourish in a suffocating and regimented environment. The new party must practice the system of delegating power and responsibility and the leadership at the apex will only give guidance and monitor developments. Everything, except confidential matters, should be delegated. Delegation is the opposite of imposing decision. It means power through people and not over the people. Delegation is the negation of manipulation. It is motivation through participation. Authority must be delegated at all tiers of the proposed party so that decisions may be taken by way of participation at every level.

Idea of Shadow Cabinet and Real Democratic Values

Muhammad Kamaruzzaman has also advised to form Shadow Cabinet. In fact Shadow Cabinet to monitor governance and Think Tank to formulate policies must be inseparable part of the proposed party. The new party, at the time of launching, should announce a Shadow Cabinet of 100 ministers. Each minister will be assisted by a Think Tank that would include three professionals in addition to ten researchers in respective fields. Each Think Tank professional members will also be members of the central consultative committee, and one, from amongst them, by rotation will represent the group to the central executive committee.

Professional members should have the rights and privilege that if anyone of them requests the leadership at the apex to call a meeting of the central consultative committee and central executive committee; they shall be bound to call such a meeting. However such professional members may or may not have voting rights.

Along with the 100 Think Tanks, an Advisory Council or Guardian Council or Council of Elders may be set up. Yet another Council of Eminent Ulama or religious scholars, as advised by Muhammad Kamaruzzaman, may also be constituted.⁴

In keeping with the democratic tradition, the proposed party should always arrive at a decision by a vote of majority and those who disagree with the decision of the majority will have the right to record the note of dissent. Recording the note of dissent must be practiced in the new party as a binding principle. That is the only way to break the hands of the conspirators, coteries and reactionary forces that sometimes try to impose undesirable decision in the name of collective decision.

Now that in the new party everyone can record their views because of the binding principle of recording the note of dissent, the conspirators and coteries will be fearful of being exposed and they will be much careful not to impose any undesirable opinion. There is no point of giving unnecessary concession in the name of consensus decision.

Moreover the new party will have to adopt such a constitution that will allow its leaders to hold and express divergent views publicly as is practiced by the political parties in the United States. Expressing constructive and positive views contrary to the declared and established party policies openly, even in front of media, will not be in anyway considered a revolt against the party, its leadership or its policies. Those leaders who will be able to win the confidence of the majority party members will be at the helm of affairs. There is no point of demanding the repeal of article 70 of Bangladesh Constitution to enable a member of the parliament to cross floor and express opinion against the very party to which s/he belongs when such freedom is not allowed within the political parties.

Non-Muslim and Muslim Brotherhood Constitution

The proposed party not only should make room for non-Muslims becoming its members but at the same time reiterate in clear terms that it is committed to make such constitutional arrangements that will remove obstacles of non-Muslim becoming the head of the

state. This will be in keeping with the political system envisaged by the Islamist political scientists of modern time. The plural and democratic nature of Islamist political order also becomes clear if someone looks at the constitutional proposals of the Muslim Brotherhood, the premier Islamist movement of the world. In 1952 Brotherhood drafted an Islamic Constitution for Egypt consisting of 103 articles.

The draft constitution puts forth the notion of a civil state based on citizenship and loyalty to the state. Muslim Brotherhood puts forward the idea of one state embracing Muslims and non-Muslims under the umbrella of loyalty to the nation (article– 88). The draft constitution reiterates that people are born free, equal in dignity, rights and liberties without any discrimination based on origin, language, religion or color (article– 77). The word used in this article is people, an inclusive neutral word in the Islamic heritage, which negates any kind of discrimination based on sex or religion. Each individual has the right to live freely, enjoying equality, security and safety (article– 78). The draft did not determine religion when recording rights. It used the word individual.

The Islamic Constitution drafted by the Brotherhood disregarded one's religion being the prerequisite of becoming the head of the state. Article– 4 stipulates that only an Egyptian can be a member of the parliament and parliamentary membership is not restricted to any particular religion or cult and article– 25 states that head of the state can be any person who meets all the conditions required for the Member of Parliament and all these disregard origin, language and religion which is compatible with the aforementioned article– 77 of the constitution.⁵

Pluralism and Sharia concern on HUDUD

The proposed party must affirm in the most unambiguous language that it believes in absolute religious freedom. The Quran states: There is no compulsion in religion [Al Quran 2: 256]. As regards apostasy, which has created a great deal of controversy and misunderstanding among the freedom loving people, the new party must make clear its position in the light of the injunction of the

Quran: *Those who believe, then disbelieve, then believe again, then disbelieve and then increase in their disbelief – God will never forgive them nor guide them to the path* [Al Quran 4: 137].

Commenting on the verse Mohammad Hashim Kamali pointed out: *“The implication is unmistakable. The text would hardly entertain the prospect of repeated belief and disbelief if death were to be the prescribed punishment for the initial act”* (6). In fact there is not a single instance that Prophet Muhammad did treat apostasy as a prescribed offense under hudd (plural hudud) or capital punishment only for leaving Islam. Prophet never put anyone to death for apostasy alone rather he let such person go unpunished. No one was sentenced to death solely for renunciation of faith unless accompanied by hostility and treason or was linked to an act of political betrayal of the community.

As a matter of fact the Quran is completely silent on the question of death as a punishment for apostasy. Apostasy does not qualify for temporal punishment. The most pertinent question is: If God has granted us the merit of freedom, he who wants to believe is allowed that right and so too the one who wants to disbelieve. How can it be imagined by a rational person that God, Who has compelled none to believe, allows us the right to compel others and force them to believe.⁷

The new party should make a call for suspension of hudd or capital punishment in such areas as adultery as long as the door of obscenity – similar to brothels, bars, offensive movies, obscene printed books and pornography – remains open; and the government cannot ensure marriage at appropriate age. Eminent Islamic scholar and Dean of the Faculty of Shariah, Qatar University Prof. Dr. Yusuf Al Qaradawi opined that before implementing hudd or capital punishment as punishment of adultery, we have to establish an ideal Islamic society and close the door of obscenity.⁸

Only recently Prof. Dr. Tariq Ramadhan, a distinguished educator of Philosophy at the University of Fribourg, Switzerland and an eminent Arab Islamic scholar, has given a clarion call for the

suspension of hudd or capital punishment for the time being, till all relevant issues have been examined by the scholars. Such suspension will be in line with the suspension of the amputation of hands of the thief by Caliph Omar (may God be pleased with him) in a famine condition when people are without food and they resort to stealing.⁹

Cultural Activism

The Islamists in Bangladesh failed to make any substantial headway in the political front during the last 64 years [1947-2011] as they largely ignored the cultural arena that deserve utmost attention. It is essential to put utmost emphasis to cultural activism to make breakthrough in the political front. In fact cultural activism deserves more emphasis than political work as the past experience has proved beyond doubt that concentrating more on political work ignoring or giving less emphasis on cultural work has failed to generate the desired political dividend.

The Islamists failed to cultivate those aspects of the local and folk culture, even finer thread of classical music and mystic songs, which does not stand in clash with our beliefs, values, ethics and norms. They have also ignored local heroes, charming natural beauty of Bangladesh; and local cultural symbols are also missing in their cultural projections. Cultural movement is the lifeline of any movement committed to bring in social reforms and renaissance. Therefore a very comprehensive cultural policy needs to be formulated and action program drawn.

Further it needs to be realized that religion is ever present in our real life and existence, culture and thought. People here are basically liberal, broadminded and moderate and opposed to constriction, bigotry, and fanaticism. People are religious but at the same time against all types of overindulgence and severity. We have to construct our political philosophy by assimilating all these elements of our mores, history and culture, customs and traditions. The proposed party shall not work to establish a theological state but still then maintain deep links with norms and ethics of Islam and core components of Muslim identity.

New Literature to face Contemporary Challenges

It is largely believed that only an identity consciousness, educated and intellectually empowered community can bring change in the society. People associated with the proposed party will be encouraged to read contemporary Islamic literature of the eminent scholars, not plagiarized books or fifty years old books which has no relevance to modern day society and its problems, particularly when modern day scholars have reached newer conclusions through ijtiḥād i.e. intellectual exercise on old and newly emerging issues. There is no reason and justification to repeat old arguments. Reading only one set of literature will result in a narrow tunnel-vision and will take the new generation nowhere.

Bangladesh is passing through the most critical period in its history. The proposed party therefore must formulate its policy keeping in view the geopolitical and strategic compulsions and erect invincible wall to protect the national interest standing on the hard rock and not on the quicksand.

The proposed party must be pragmatic, open to all yet conscious of its goal. It is suggested that a rational, moderate and people oriented socio-cultural and political program be formulated which is suitable to the genius of the people of Bangladesh.

Last but not the least, the proposed political party, true to the democratic culture and tradition, will maintain harmonious relations with every other political organization. But it will not, in any way, subordinate itself to any other political organization or leader however sagacious seemingly they might appear to be.

The new party will not maintain extra territorial or secret link with any other political organization or leader who may tend to control it or influence its functioning. It will strictly follow its own constitution and single-handedly try to accomplish its own policies and objectives.

The new party will never take position on political issues in opposition to the dreams, wishes and aspirations of the overwhelming majority people. But the million dollar question is:

who and where are those young political leaders born after 1971 who will make a call for the formation of such a party to bring an end to the current impasse of the Islamists in Bangladesh and usher in an era of a bright prosperous future.

Notes:

1. Abdul Halim Abu Shuqqah, *Rasuler Juge Nari Shadhinata* (Bengali tr. of *Tahrirul Mar'ah Fi Asrir Risalah*), Vol. IV, Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT), Dhaka, 2006, pp 79-80.
2. Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Islamic Texts Society, Cambridge, 1991, p 383.
3. This view is also shared by Dr. Anas S. Al Shaikh Ali, Academic Advisor, IIIT, London, UK.
4. The idea of formation of Shadow Cabinet of hundred ministers each of whom will head a Think Tank is also shared by Dr. Ahmad Totonji. See Shah Abdul Halim, *Totonji on the Backwardness of the Muslim Ummah*. www.shahfoundationbd.org
5. The Legal Concept of an Islamic State According to the MB, Ikhwanweb – Cairo, Egypt, Monday, May 08, 2006. Also see Shah Abdul Halim, *The Concept of Ummah and Pluralist Bangladesh*. www.shahfoundationbd.org.
6. Mohammad Hashim Kamali, *Freedom of Expression in Islam*, Chapter IX. - Freedom of Religion (Al-Hurriyyah al-Diniyyah), Ilmiah Publishers, Kuala Lumpur, 1998, pp 97-98
7. See Shah Abdul Halim, *Islam & Pluralism*, www.shahfoundationbd.org
8. Prof. Dr. Yusuf Al Qaradawi, *Shariatul Islam Khuluduha Wa Salahuha Lit-tatbiki Fi Kulli Jamanin Wa Makan*, Bengali tr. *Islami Shariater Bastobayan*, Oddhai- Bartaman Juga Islami Shariat Bastobayaner Purba Sharta, Khairun Prokashani, Dhaka, 2003, pp 174-179.
9. Shah Abdul Halim, *Intent of the Islamic Law*, www.shahfoundationbd.org.

আরব বসন্ত এবং দেশে দেশে ইসলামী আন্দোলন*

ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক

১.

২০১০ সালের শীতকালে তিউনিশিয়ার এক মফস্বল শহরে ২৬ বছরের এক ফেরিওয়ালা যুবক মুহাম্মদ বুয়াজিজি প্রশাসনের হয়রানির প্রতিবাদে যখন নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে দেয়, তখন কে জানত এ ঘটনার মাত্র ২৭ দিনের মাথায় প্রেসিডেন্ট জয়নুল আবেদিন বেন আলীর ২৩ বছরের স্বৈরশাসনের অবসানের মাধ্যমে সূচনা হবে ‘আরব বসন্তের’। তিউনিশিয়ার পর মিসর। তাহরির স্কোয়ারের তিন সপ্তাহের আন্দোলনে ফেব্রুয়ারি মাসে বিদায় নেন তিন দশকের শক্তিশালী স্বৈরশাসক হোসনি মোবারক। জুন মাসে ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট সৌদি আরব পালিয়ে যান (বর্তমানে আছেন আমেরিকায়) এবং তার ৩৩ বছরের শাসন অবসানের জন্য একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। বাহরাইনের বিদ্রোহ দমনে ব্যবহৃত হয়েছে সৌদি সেনাবাহিনী। মরক্কো ও জর্ডানে সংস্কার সাধিত হয়েছে। লিবিয়ার ৪২ বছরের শাসক গাদ্দাফির পতন ঘটেছে। সিরিয়ার বাশার আল আসাদের পতন ঠেকাতে তার সরকার এ পর্যন্ত জাতিসঙ্ঘের হিসাব অনুযায়ী ৫,৫০০-এর বেশি মানুষকে হত্যা করেছে। মুসলিম বিশ্বে পরিবর্তনের যে সুবাতাস বইছে তা ঠেকানোর সাধ্য কারো নেই।

সেপ্টেম্বর মাসে নিউইয়র্কে এক বন্ধুর মুখে গুনলাম, মধ্যপ্রাচ্যে কী ঘটতে পারে তা নিয়ে স্টেট ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন থিঙ্কট্যাঙ্ক প্রায় ২০০টি বিকল্পের কথা ভেবেছিল। কিন্তু তাদের ওই বিকল্পের মধ্যে আরব বসন্ত ছিল না। অবিশ্বাস্য মনে হয়। কিন্তু আমার ওই বন্ধু কোনো সাধারণ লোক নন। জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক। যুক্তরাষ্ট্র সরকার মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে তার কাছ থেকে মাঝে মধ্যে পরামর্শও নিয়ে থাকে। নীতিনির্ধারকদের সাথে তার যোগাযোগ আছে। তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্য, মুসলিম মধ্যপ্রাচ্য, ভৌগোলিক কৌশলগত অবস্থানে অবস্থিত মধ্যপ্রাচ্য। সুয়েজখাল ও হরমুজ প্রণালী যদি কয়েক ঘণ্টার জন্যও বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তো সারা বিশ্বে

* নিবন্ধটির লেখক বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারি জেনারেল। ২০১২ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি দৈনিক নয়া দিগন্তে এটি প্রকাশিত হয়।

হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে। সেই অঞ্চল নিয়ে, পৃথিবীকে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তারা চিন্তা না করে পারেন? ‘আরব বসন্ত’ পাশ্চাত্যের রাডারে ধরা না পড়ার কারণ হচ্ছে মানুষ সাধারণত কার্যকারণ এবং এর ফলাফল নিয়েই ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকে; কিন্তু মানুষ জানে না সৃষ্টিকর্তা কার্যকারণ ও ফলাফল দুটোই নিয়ন্ত্রণ করেন।

আজ অবশ্য এ বিষয়টি সুনিশ্চিত, আরব বসন্তের সুদূরপ্রসারী ফলাফল শুধু আরব বিশ্বের রাজনীতিতেই পড়বে না। এর প্রভাব গোটা বিশ্ব-রাজনীতির ওপর পড়বে। তবে লক্ষণীয় যে, ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত এক কোটি চার লাখ জনগোষ্ঠীর উত্তর আফ্রিকার ছোট্ট দেশ তিউনিশিয়াই আরব বসন্তের নেতৃত্ব দেয়ার গৌরব অর্জন করল।

তিউনিশিয়ায় নির্বাচনের ফলাফল চূড়ান্ত: ইসলামপন্থী আন-নাহদার ঐতিহাসিক বিজয় অক্টোবরে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তিউনিসিয়ায়। ২১৭ আসনের গণপরিষদে রশিদ ঘানুশীর ইসলামপন্থী দল আন-নাহদা ৮৯ আসন পেয়ে সর্ববৃহৎ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ২৯ আসন পেয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে সিপিআর (কংগ্রেস ফর দ্য রিপাবলিক), আর ২৬ আসন পেয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করে আরিধা। শেষোক্ত দু’টি দলই সেকুল্যার আদর্শে বিশ্বাসী। এরপর নভেম্বর মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় মরক্কোতে। ৩৯৫ আসনের পার্লামেন্টে ১০৭ আসন পেয়ে সর্ববৃহৎ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে মধ্যমপন্থী ইসলামী দল জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি।

রশিদ ঘানুশীর সাথে আমার পরিচয় দীর্ঘদিনের। সর্বশেষ দেখা ইস্তাম্বুলে ২০০৯ সালের মে মাসে একটি ইসলামী সম্মেলনে। ইতোপূর্বে ওই বছরের মার্চ মাসে লন্ডনে তাঁর বাসায় গিয়েছিলাম। এককেন্দ্রিক বিশ্বে মুসলমানদের অবস্থা নিয়ে তাঁর সাথে দীর্ঘ আলোচনা হয়। এর মাত্র কয়েক মাস আগে ইসরাইল গাজা উপত্যকায় ধ্বংসলীলা চালিয়েছিল। সূরা বনি ইসরাইলের ৭ নম্বর আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেছিলেন, ‘এতে করে ইসরাইলের চেহারা বিকৃত হয়েছে।’ আলোচনার এক পর্যায়ে তার সব সময়ের হাসিমাখা মুখে আরো একটু হাসি নিয়ে আমাকে বলেছিলেন, ‘বাংলাদেশের অবস্থা যখন তিউনিশিয়ার মতো হবে, তখন আপনিও আমার মতো আর নিজের দেশে থাকতে পারবেন না।’ কে জানত এ আলোচনার মাত্র ২২ মাসের মাথায়, ২০১১ সালের জানুয়ারি মাসে ২০ বছরের অধিক সময়ের নির্বাসনের অবসান ঘটিয়ে ৭০ বছর বয়স্ক রশিদ ঘানুশী তিউনিশিয়ায় ফিরে যাবেন এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের জন্য। ভবিষ্যতের খবর একমাত্র আল্লাহর কাছেই থাকে (সূরা লোকমান ৩১:৩৪) এবং তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন (সূরা ইউসূফ ১২:১০০)। দেশে ফিরে ঘানুশী ঘোষণা দেন নিজে কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না। ক্ষমতায় গেলে তার দল ইসলামী শরীয়া আইন বাস্তবায়ন করবে না। তুরস্কের একে পার্টির আদলেই সরকার পরিচালনা করবে।

অতি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত মিসরের নির্বাচনে ইখওয়ানের রাজনৈতিক শাখা ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস পার্টি (এফজেপি) ৫০৮ আসনের পার্লামেন্টে সর্বমোট ২৩৫ আসন পেয়ে সর্ববৃহৎ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ১২৩টি আসন পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে সালাফিপন্থী নূর পার্টি। ৩৮টি আসন পেয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে উদারপন্থী ওয়াফ্দ পার্টি। নিয়মের ব্যত্যয় না ঘটলে ইখওয়ানই আগামীতে কোয়ালিশন সরকার গঠন করবে। মোবারকের আমলে ইখওয়ান নিষিদ্ধ দল হলেও পার্লামেন্টে বিভিন্ন নামে এবং নির্দলীয়ভাবে ইখওয়ানের আসনসংখ্যা ছিল ৮০। ডাক্তার, প্রকৌশলী ও আইনজীবীদের সংগঠনের বেশির ভাগই ছিল ইখওয়ানের দখলে। সমাজসেবার কারণে তারা ছিলেন জনগণের খুব কাছাকাছি। জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণের মতো তাদের কোনো রাজনৈতিক দুর্নামও ছিল না। তারপরও তারা ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস পার্টির নামে আলাদা একটি প্লাটফর্ম সৃষ্টি করেছেন। ঘোষণা করেছেন একজন ক্যাথলিক খ্রিস্টানকেও মিসরের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে মেনে নিতে তাদের কোনো আপত্তি থাকবে না।

২.

আমার তিনবার তুরস্ক সফরের সুযোগ হয়েছে। ১৯৯৬ সালে প্রথম সফরের সময় নাজমুদ্দিন আরবাকান ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। ওই সফরে রেফাহ পার্টির এক যুবক সংসদ সদস্য আমাকে বলেছিলেন, ‘ইসলামের জন্য তুরস্কে কাজ করা ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের চেয়ে হাজার গুণ কঠিন।’ স্মরণ করা যেতে পারে, একটি কবিতা লেখার কারণে রজব তৈয়ব এরদোগানকে জেলে যেতে হয়েছিল এবং তিনি নির্বাচন করার জন্য অযোগ্য ঘোষিত হয়েছিলেন। সেই তুরস্ক আজ মুসলিম বিশ্বের অলিখিত নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হওয়ার সম্মান অর্জন করেছে।

আতাতুর্কের ‘আধুনিক তুরস্কে’ সেক্যুলারিজমের শিকড় সমাজ ও রাষ্ট্রের অনেক গভীরে প্রবেশ করেছে। এমনকি, সেক্যুলার ফ্রাণ্সের চেয়ে সেক্যুলার তুরস্ক অনেক বেশি সেক্যুলার। তুরস্কের সেনাবাহিনী নিজেদের সেক্যুলারিজমের রক্ষাকর্তা বলে মনে করে। তারা ১৯৬০, ১৯৮০ এবং সর্বশেষ ১৯৯৮ সালে ক্ষমতা দখল করেছিল। ১৯৯৮ সালে নাজমুদ্দিন আরবাকানকে যখন ক্ষমতাচ্যুত করা হয় তখন রজব তৈয়ব এরদোগান ছিলেন তুরস্কের বৃহত্তম শহর ইস্তাম্বুলের মেয়র। ক্ষমতাচ্যুতির পর নীতিগত প্রশ্নে এরদোগানের নেতৃত্বে অপেক্ষাকৃত কম বয়স্কদের সাথে বর্ষীয়ান নেতা আরবাকানের মতবিরোধ হয়। আরবাকান সরাসরি ইসলামের কথা বলতেন এবং পাশ্চাত্যের সমালোচনা করতেন। তাঁর এসব বক্তব্যকে সেনাবাহিনী চিত্রিত করে সেক্যুলারিজমের বিরোধিতা রূপে।

এরদোগান ও আবদুল্লাহ গুল ‘জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি’ নামে নতুন দল গঠন করে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে সেক্যুলারিজমকে এ বলে সংজ্ঞায়িত করেন যে, সেক্যুলারিজমের অধীনে ইসলামসহ সব ধর্ম পালনের স্বাধীনতা রয়েছে। তারা গুলেন

মুভমেন্ট ও অন্যান্য উদারপন্থীদের সমর্থন লাভ করেন। তাছাড়া তারা অর্থনৈতিক উন্নতির ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দেন। ফলে ২০০২ সালের নির্বাচনে নবগঠিত একে পার্টি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। পরপর দু'টি নির্বাচনে তারা বিজয়ী হয়। একে পার্টির নেতৃত্বে তুরস্ক অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। দীর্ঘদিন ধরে তুরস্ককে একটি ছোট্ট গ্রুপ শাসন করে আসছিল। এ কয়েমি স্বাধীনবাদী গোষ্ঠীতে ছিল সেনাবাহিনীর একটা অংশ, উচ্চতর আদালতের বিচারপতিদের একটি অংশ, সুশীল সমাজ ও সংবাদমাধ্যমের একটি অংশ। তারাই সিদ্ধান্ত নিত কারা ক্ষমতায় থাকবে বা থাকবে না। এরদোগানের আগে কোনো প্রধানমন্ত্রী এদের চ্যালেঞ্জ করে ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারেননি। অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে এরদোগান সংবিধান সংশোধন করেছেন এবং সত্যিকার অর্থে তুরস্কে গণতন্ত্র কয়েম করেছেন।

তুরস্কই প্রমাণ করল, নেতৃত্বের কাজ হচ্ছে একটি পথ বন্ধ হলে আরো তিনটি পথ খোলা। দ্বীনের পথে কোনো কাজে সক্ষীর্ণতা নেই (সূরা হজ ২২:৭৮), যারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে আল্লাহ তাদের পথ দেখিয়ে দেন (সূরা আনকাবুত ৬৯:২৯)।

তুরস্কের একে পার্টি এবং মিসরের ইখওয়ানুল মুসলিমিনের পথ ধরে ৬০ বছরেরও অধিক সময় ধরে কার্যরত ভারতের জামায়াতে ইসলামী গত বছরের এপ্রিল মাসে 'ওয়েলফেয়ার পার্টি অব ইন্ডিয়া' নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেছে। তাদের স্লোগান হচ্ছে— ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা ও সমতা। পাশাপাশি জামায়াত তার আদর্শিক কার্যক্রম চালিয়ে যাবে। ১৬ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটিতে প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারি জামায়াতের দায়িত্বশীল হলেও তাতে পাঁচজন অমুসলমান রয়েছেন, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন কেরালা রাজ্যের ক্যাথলিক খ্রিস্টান ফাদার আব্রাহাম জোসেফ এবং কর্নাটকের সাবেক মন্ত্রী (অমুসলিম) ললিতা নায়ার। এরা দু'জনই সহসভাপতি।

অনুরূপভাবে মালয়েশিয়ার ইসলামী আন্দোলন পিএএস (এক সময় যারা দু'টি রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল; এখন শুধু একটিতে, কিন্তু ফেডারেল পার্লামেন্টেও তাদের সদস্য রয়েছে) ইসলামী রাষ্ট্রের কথা বাদ দিয়ে শুধু ন্যায়বিচারের কথাই বলছে। তুরস্ক, তিউনিশিয়া, মালয়েশিয়া, মিসর ও ভারতে ইসলামী আন্দোলনের এই কৌশলগত অবস্থান পরিবর্তনের আসল লক্ষ্য হচ্ছে দ্বীনের বাস্তবায়ন (সূরা সফ ৬১:৯)। কৌশলগত সঠিক সিদ্ধান্ত ছাড়া দ্বীনের বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ধীরগতিতে চলা ছিল রাসূলগণের সবচেয়ে বড় সুন্নাত। সপ্তম হিজরীর শুরুতে অর্থাৎ নবুওয়তের ২০ বছর পর মদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয় (সূরা আল মায়িদা ৫:৯) এবং অষ্টম হিজরীতে অর্থাৎ নবুওয়তের ২১ বছর পর নিষিদ্ধ হয় সুদ (সূরা আল বাকারা ২:২৭৫)। অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের তিন মাস পর অনুষ্ঠিত হজেও কাফেরদের জাহেলী প্রথা অনুসরণের স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছিল (সূরা তওবা ৯:২৮)।

৩.

রাসূল (সা)-এর জীবনে সীমাহীন দুঃখকষ্ট ছিল, কিন্তু তেমন কোনো পরাজয় ছিল না। ‘রাসূলের জীবনে তোমাদের জন্য নিহিত আছে উত্তম আদর্শ’ (সূরা আল আহযাব ৩৩:২১)। ওহুদের বিপর্যয় কাটিয়ে উঠে মুসলমানদের মনে সাহস সঞ্চয়ের জন্য পরদিনই তিনি আহত সাহাবীদের নিয়ে শত্রুসৈন্যের পেছনে ধাওয়া করেছিলেন। এর আগে হিজরতের পর মক্কায় কাফেররা অনেকটা হাঁফ ছেড়ে বলেছিল, ‘আপদ চলে গেছে, বাঁচা গেল।’ কিন্তু মদিনায় পৌঁছেই তিনি মক্কা থেকে সিরিয়ামামী বাণিজ্য কাফেলার ওপর চাপ সৃষ্টি করেন মক্কার ওপর অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টির জন্য। প্রথম হিজরীতে তাঁর গৃহীত এ কৌশলই ছিল দ্বিতীয় হিজরীতে সংঘটিত বদর যুদ্ধের পটভূমি। দ্বিতীয় হিজরীতে বদর যুদ্ধ না হলে তৃতীয় হিজরীতে ওহুদ, অতঃপর পঞ্চম হিজরীতে খন্দক, ষষ্ঠ হিজরীতে হুদাইবিয়া এবং অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয় হতো না। হুদাইবিয়ার সন্ধি প্রমাণ করে রাসূল (সা)-এর কর্মকৌশলের মোকাবেলায় মক্কার কাফেররা ছিল অসহায়। সন্দেহ নেই, রাসূলকে আল্লাহ পাক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করেছেন ওহীর মাধ্যমে। (অবশ্য এটাও সত্য যে, সব ব্যাপারে ওহী নাজিল হতো না)। ওহীর দরজা যখন বন্ধ, ইসলামী নেতৃত্বকেই সঠিক স্ট্র্যাটেজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভুল করলে আন্দোলন কোনো দিন সফলতার মুখ দেখবে না।

কুরআনের পাতায় পাতায় আল্লাহ ইতিহাসের আলোচনা করেছেন: জানা ইতিহাস (সূরা বাকারা ২:৪৭), অজানা ইতিহাস (সূরা কাহাফ ১৮:৮৩-৮৬)। উদ্দেশ্য হলো মুসলমানেরা যেন ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় (সূরা আল ইমরান ৩:১৩৭, আশ্বিয়া ২১:১১)। সূরা আল ইমরানের ১৪০ নম্বর আয়াতের (এতকালের উত্থান-পতন, মানুষের মধ্যে আমি এর আবর্তন করে থাকি) ওপর ভিত্তি করেই প্রখ্যাত দার্শনিক ইবনে খালদুন বলেছেন, ‘ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে’। আল্লাহ মানুষকে চিন্তাশীল হতে বলেছেন (সূরা আল ইমরান ৩:১৯০); বুদ্ধি-বিবেক কাজে লাগানোর তাগিদ দিয়েছেন (সূরা আল রাদ ১৩:৪); নিজেদের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণের কথা বলেছেন (সূরা হাশর ৫৯:২)। বর্তমান প্রেক্ষাপটে ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্বকে একটু দূরে দেখার চেষ্টা করতে হবে। পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। ইউরোপ শত চেষ্টা করেও অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে উঠতে পারছে না। ১ ট্রিলিয়ন (দশ হাজার কোটি) ডলার খরচ করে সাড়ে চার হাজার মার্কিন সৈন্যের প্রাণের বিনিময়ে ইরাকে প্রায় ১০ বছর যুদ্ধ চালিয়ে ১৩ ট্রিলিয়ন (১৩০ হাজার কোটি) ডলারের ঋণের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্র আজ অনেকটা দুর্বল। সাবেক প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের আমলের এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, David Roth Kopf অতি সম্প্রতি তার প্রকাশিত বই Running the World-এ লিখেছেন, “We can’t write checks the way that we once could; we can’t deploy troops in the way that

we once did.” অর্থাৎ ‘অতীতের মতো ইচ্ছা করলেই আমরা যেমন আর্থিক অনুদান দিতে পারছি না, তেমনি আমরা সামরিক অভিযানও পরিচালনা করতে পারছি না।

একবিংশ শতাব্দীর এই বিশ্বে ক্ষমতার ভারসাম্যের দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। চীন ও ভারতের উত্থান ঘটছে। নেতৃত্বের শূন্যতা সৃষ্টি হচ্ছে। যে জাতিকে আল্লাহ তায়ালা পাঠিয়েছেন গোটা মানবতার কল্যাণের উদ্দেশ্যে নেতৃত্বদানের জন্য (সূরা আল ইমরান ৩:১১০); মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসার জন্য (সূরা ইব্রাহিম ১৪:১); সেই মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্বদানের জন্য (সূরা আল ফুরকান ২৫:৭৪) দেশে দেশে ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্বকে বাস্তবধর্মী ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্য অর্জনে তুরস্কের একে পার্টি, মিসরের ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস পার্টি, তিউনিশিয়ার আন-নাহাদা পার্টি এবং ওয়েলফেয়ার পার্টি অব ইন্ডিয়া থেকে অনেক অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে। ছোট-বড় ইসলামী দলগুলোকে সব সঙ্কীর্ণতা ও আত্মসন্ত্রিতার উর্ধ্বে উঠতে হবে। অতীতের ভুলের জন্য ক্ষমা চাওয়ার মধ্যে কোনো দোষ নেই। মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মুসিবত বাড়ানোর জন্য আল্লাহ পবিত্র কুরআন নাজিল করেননি (সূরা তাহা ২০:১)।

আরব বসন্ত গোটা বিশ্বকে দারুণভাবে নাড়া দিয়েছে এবং পশ্চিমা পর্যবেক্ষকদের অনেকটা অবাক করে দিয়ে ইসলামপন্থীরাই এর ফসল ঘরে তুলেছেন। সাম্প্রতিককালে আরব বিশ্বের নির্বাচনী ফলাফল এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহন করছে। প্রশ্ন হচ্ছে, দক্ষিণ এশিয়ার ১৬ কোটি মানুষের বাংলাদেশের গায়ে এই আরব বসন্তের বাতাস কখন লাগবে?

জীবনের সর্বক্ষেত্রেই রাসূল (সা) এর আদর্শকে

অনুসরণ করতে হবে*

অধ্যাপক এ কে এম নাজির আহমদ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর অধ্যাপক এ কে এম নাজির আহমদ বলেছেন, রাসূল (সা) হলেন আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রের আদর্শ। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই রাসূল (সা) এর আদর্শকে অনুসরণ করতে হবে। মানব জীবনের এমন কোনো দিক নেই যে দিকের প্রতি রাসূল (সা) এর দিকনির্দেশনা নেই। নবুয়াতের পূর্বে তিনি সমাজ সংস্কারের অনেক চেষ্টা করেছেন কিন্তু পরিপূর্ণ সফল হননি। নবুয়াতের পর তিনি তেইশ বছরে একটি কল্যাণময় শান্তির সমাজ উপহার দিয়েছিলেন। এটা সম্ভব হয়েছিল একমাত্র কোরআনের কারণে। তিনি বলেন, মানব রচিত ফর্মুলা মানুষের কল্যাণ আনতে পারে না। মানবজাতির মুক্তি, শান্তি ও কল্যাণ আসে আসমানী ফর্মুলায়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে কোরআনকে অনুসরণ করতে তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি আজ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরীর উদ্যোগে জাতীয় প্রেস ক্লাবে পবিত্র সিরাতুল্লাহী (সা) উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী সেক্রেটারী নুরুল ইসলাম বুলবুলের সভাপতিত্বে সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, ঢাকা মহানগরী সহকারী সেক্রেটারী মো: সেলিম উদ্দিন, ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ ও মঞ্জুরুল ইসলাম ভূইয়া, ঢাকা মহানগরী কর্মপরিষদ সদস্য রেদওয়ান উল্লাহ শাহিদী, ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মোস্তফা ও কবির আহমদ প্রমুখ।

প্রধান অতিথি বলেন, রাসূল (সা) মক্কায় জনসেবার কাজ করেও সেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। মদীনাবাসী রাসূল (সা) এর কথার মর্ম বুঝতে পেরে তারা ইসলাম গ্রহণ করে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে রাসূল (সা)কে সহযোগিতা করেছে। আরবের

* ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে এক আলোচনা সভায় জামায়াতের তৎকালীন নায়েবে আমীর অধ্যাপক নাজির আহমদের বক্তব্য। এটি জামায়াতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশিত।

লোকজন তাঁকে ‘আলামীন’ হিসাবে জানতো। যখন তিনি কোরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার দাওয়াত দেয়া শুরু করলেন তখনই তাঁর বিরোধিতা শুরু হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ রটানো হয় এবং তাঁর উপর নির্যাতন শুরু হয়। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী আল্লাহর দেওয়া ফর্মুলা ও রাসুলের দেখানো পথ অনুসরণ করে কল্যাণকর সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

জোর করে কিংবা অস্ত্র দিয়ে মানুষ হত্যা করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যায় না। ইসলাম কখনো জঙ্গিবাদকে সমর্থন করে না। ইসলামের সৌন্দর্য মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে। মানুষের চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন আনতে হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য রাসূল (সা) এর পথ অনুসরণ করে আমাদেরকে সামনে এগুতে হবে। যারা পেটের ক্ষুধা নিবারণের কথা বলে ক্ষমতায় গিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবে বলে ঘোষণা দিচ্ছে, তারা ইসলামের মর্মার্থ ও রাসূল (সা) এর জীবনী সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেনি। এ পথে বাধা আসবে, নির্যাতনের শিকার হতে হবে, অপবাদ দেওয়া হবে। জামায়াতে ইসলামী এদেশে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কয়েম করতে চায় বলেই জামায়াতের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অপবাদ দেওয়া হচ্ছে। জামায়াতের নেতৃবৃন্দ কোনো প্রকার অপরাধের সাথে জড়িত ছিলেন না। জামায়াতে ইসলামীকে ধ্বংস করতেই এই ষড়যন্ত্র। এজন্য আমাদেরকে সাহসের সাথে সামনে এগুতে হবে। আল্লাহ আমাদের জন্য সহজ পথ খুলে দিবেন। জামায়াতের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ সম্মানের সাথে নির্দোষ প্রমানিত হয়ে কারাগার থেকে বের হয়ে আসবেন। তাদের নেতৃত্বে আমরা এদেশে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কয়েম করবো।

ইসলামী আন্দোলনে হীনমন্যতাবোধের সুযোগ নেই*

আবু নকীব

ইসলামী আন্দোলন নিছক রাজনৈতিক আন্দোলন নয়। নয় নিছক ক্ষমতার রাজনীতি। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে ক্ষমতায় পাঠাবার আন্দোলনও নয় এটি। বরং আল্লাহর দীন বা ইসলামী আদর্শকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল দিক ও বিভাগে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠাই ইসলামী আন্দোলনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। ক্ষমতা লাভের পথ দীর্ঘ মনে হবার কারণে অথবা বিপদসংকুল ও বাধা প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হবার কারণে ইসলামী আদর্শ তথা সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার কাজ আপাতত বাদ দিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্ষমতার রাজনীতির নিয়ামক শক্তিসমূহের কাছে গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের কৌশল অবলম্বনের পথ বেছে নেয়ার যুক্তি বাস্তবে কতটা টেকসই হতে পারে গভীরভাবে তা তলিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে। অবশ্য ইসলামী আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্টদের একটা পথ বন্ধ হলে দশটা পথ খোলার মত যোগ্যতা-দক্ষতা অবশ্যই থাকতে হবে। তবে বাস্তবে পথ বন্ধ হবার আগে কৃত্রিমভাবে নিজেদের পক্ষ থেকে পথ বন্ধ করে কোনো কৌশল অবলম্বনের চিন্তা-ভাবনা হীনমন্যতারই পরিচয় বহন করে এতে কোনো সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ নেই।

সম্প্রতি বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে চতুর্মুখী চক্রান্ত ষড়যন্ত্র চলছে। তথ্য সন্ত্রাস, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস থেকে বিচারিক সন্ত্রাসের আয়োজন চলছে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের চিন্তার ঐক্য, পারস্পরিক আস্থা সুদৃঢ় থাকা অপরিহার্য। তারচেয়েও বেশি অপরিহার্য হল আল্লাহর উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুলের ভিত্তিতে প্রতিকূলতার মোকাবিলায় অসীম ধৈর্য ও ছাবেতে কদমের সাথে ময়দানে সুদৃঢ় অবস্থান নিয়ে অকুতোভয়ে টিকে থাকার, বরং সামনে অগরসর হবার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। পক্ষান্তরে ইসলামী আন্দোলনের প্রতিপক্ষের এ সময়ের কৌশল হয়ে থাকে নানা কাল্পনিক, তাত্ত্বিক বিভ্রান্তির গুঁজব ছড়িয়ে চিন্তার ঐক্যে ফাটল ধরানোর জন্যে তথ্য

* বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী কারান্তরালে থাকায় ‘আবু নকীব’ ছদ্মনামে এই নিবন্ধটি লিখেন। ২০১৩ সালের ২৭ আগস্ট দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকার উপ-সম্পাদকীয় হিসেবে এটি প্রকাশিত হয়।

সন্ত্রাস জোরদার করা। দুর্ভাগ্যজনকভাবে কখনও কোনো ব্যক্তি বিশেষের অপরিণামদর্শী কথা বা কার্যক্রমকে এরা সূত্র বা তথ্য উপাত্ত হিসাবে ব্যবহার করে এ ধরনের সুযোগ নিয়ে থাকে।

সম্প্রতি বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে মহল বিশেষের পক্ষ থেকে এ ধরনের প্রচারণা বেশ সুকৌশলে চালানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে তারা কতিপয় ব্যক্তির একটি অপরিণামদর্শী ও অপরিপক্ব পদক্ষেপজনিত একটি বৈঠককে এবং পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধকে তথ্য-উপাত্ত হিসাবে ব্যবহার করছে। যদিও তাদের সকল জল্পনা-কল্পনাকে ভুল প্রমাণ করে তাদের পরিকল্পিত প্রচারণার মুখে ছাই নিয়ে ইসলামী আন্দোলনের যুবক ও ছাত্রকর্মী তথা নতুন প্রজন্মই রাজপথে শক্ত অবস্থান নিয়ে ইসলামী আন্দোলনের উপর সরকার পরিচালিত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রতিবাদ করে যাচ্ছে। অকুতোভয়ে জীবন দিতেও কুণ্ঠা বোধ করছেন না। এরপরও মহল বিশেষের পক্ষ থেকে ইসলামী আন্দোলনের মধ্যে চিন্তার বিভ্রান্তি ছড়ানোর অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে অব্যাহতভাবে।

ইসলামী আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট নবীন ও প্রবীণ সকল পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের সামনে বর্তমানে মিশরের ইসলামী সংগঠন মুসলিম ব্রাদারহুডের উপর যে গণহত্যা চালানো হচ্ছে তা থেকে দুটো বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায়। এক, তথাকথিত দেশী-বিদেশী সোশ্যাল এলিটদের সমর্থন পাওয়ার জন্যে বা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবার জন্যে দলের ইসলামী পরিচিতি বর্জন করেও কোনো লাভ হয় না। দুই, ইসলামের সংগঠিত শক্তি হওয়াটাই মূল অপরাধ।

মিশরের ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে তো স্বাধীনতা বিরোধিতার কোনো অভিযোগ আনার সুযোগ নেই। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বরং তাদেরই ছিল সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা। তারপরও তাদের দেশের প্রথমবারের মত গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে কেন ক্ষমতাচ্যুত করা হয়?

ইতিপূর্বে ১৯৯১ সনে আলজেরিয়ায় ইসলামী সলভেশন ফ্রন্ট প্রথমবারের মত নির্বাচনে ক্ষমতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতেই সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখলকে গণতন্ত্রের প্রবক্তা বিশ্ব মোড়লেরা অকুণ্ঠ সমর্থন দেয় নিছক ইসলাম ঠেকাবার জন্যে। তাদের বিরুদ্ধেও আলজেরিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামে বিরোধিতার কোনো অভিযোগের সুযোগ ছিল না। ইসলামের পক্ষের সংগঠিত শক্তি হওয়াই তাদের অপরাধ। অতএব বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকারের অবস্থান যে নিছক ইসলামী আদর্শের পক্ষের শক্তির ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি রোধ করার জন্যেই, এতে কোনো বিবেকবান ব্যক্তির মনেই সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ থাকতে পারে না। কেউ কেউ বলার চেষ্টা করে মুসলিম ব্রাদারহুড তার নাম-পরিচয় পাল্টিয়ে অন্য নামে ইসলামী পরিচিতি বাদ দিয়ে

সংসদ ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সাফল্য অর্জন করেছে, বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের কবে শুভ বুদ্ধির উদয় হবে!

আসলে কি মুসলিম ব্রাদারহুড তাদের নাম পরিবর্তন করেছে নাকি নির্বাচনী কৌশল হিসেবে একটা ফ্রন্ট করেছে? ব্রাদারহুড নিষিদ্ধ থাকা অবস্থায় এর আগেও তারা ওয়াফদ পার্টির হয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়েছে। এবারেও তাদের একই কৌশল আমরা দেখতে পাই একটু ভিন্ন আংগিকে। কিন্তু আজকের পরিস্থিতির মোকাবিলা তাদের করতে হচ্ছে মুসলিম ব্রাদারহুডের পক্ষ থেকেই। ভিন্ন নামে নির্বাচনের পরও তাদের ক্ষমতায় টিকতে দেয়া হয়নি। এর প্রতিবাদে মুসলিম ব্রাদারহুডের নেতৃত্বে তাদের সংগঠনের সুনামেই ইনশাআল্লাহ আগামীতে মিশরে একই সাথে ইসলাম ও গণতন্ত্রের বিজয় হবে একটি সফল ও ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে। সম্প্রতি একটি পত্রিকায় জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে চিন্তার বিভ্রান্তি ছড়ানোর কৌশল হিসেবে একটা গোপন বৈঠক ও একই প্রবন্ধকে ব্যবহার করা হয়েছে। উক্ত প্রবন্ধে নাকি এও বলা হয়েছে যে, ভারতের জামায়াতে ইসলামী তাদের অতীতের ভুল শুধরিয়ে দলের নাম পরিবর্তন করে একটা প্লাটফর্ম করেছে যাতে নেতৃত্বের পর্যায়ে একজন হিন্দু, একজন খৃস্টানও আছে। আসলে জামায়াতে ইসলামী হিন্দু তার নাম পরিবর্তন করেনি। তারা অতীতে নির্বাচনে কোন ভূমিকাই রাখতো না। ভোটও দিত না। তারা মূলত একটা ‘সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ধর্মীয়’ প্রতিষ্ঠান হিসাবেই কাজ করে আসছিল। মুসলিম পার্সনাল ল’-এর সংরক্ষণের ব্যাপারে তারা সকল ইসলামী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সাথে মিলে কাজ করেছে। এরপর নির্বাচনী রাজনীতিতে ভূমিকা রাখার জন্যে একটা প্লাটফর্ম দাঁড় করিয়েছে, এটা তাদের কার্যক্রমের একটা নতুন অগ্রগতি বলতে পারি। কিন্তু অতীতের ভুল শুধরে তারা নাম পরিবর্তন করেছে, এমন কথা যদি কেউ বলে থাকেন বা লিখে থাকেন তা হলে তিনি তথ্য বিচ্যুতির আশ্রয় নিয়েছেন। এই তো সেদিনও জামায়াতে ইসলামী হিন্দুর আমীর বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন বাতিলের ব্যাপারে সরকারের উদ্দেশে উচ্চ আদালতের রায়ের প্রতিবাদ করে বিবৃতি দিয়েছেন। তার বিবৃতি বিবিসিতেও প্রচারিত হয়েছে।

এটা ঐতিহাসিক বাস্তব ঘটনা যে, ’৭১ সালে পাকিস্তানের অখণ্ডত্বের পক্ষে শুধু জামায়াতে ইসলামীই অবস্থান নেয়নি। বরং সকল ইসলামী ও মুসলিম সংগঠন, প্রতিষ্ঠান এবং সুপরিচিত সব ইসলামী ব্যক্তিত্ব পাকিস্তানের অখণ্ডত্বের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল, সেই কারণেই মুসলিম লীগের সকল গ্রুপসহ পিডিপি, কৃষক শ্রমিক প্রজাপার্টি, নেজামে ইসলাম পার্টি ও জামায়াতে ইসলামকে একযোগেই নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। বর্তমানে জামায়াতে ইসলামী ছাড়া ঐসব দলের আর কোনোটাই সংগঠিত শক্তি হিসেবে রাজনীতিতে সক্রিয় নাই বলেই তাদের নিয়ে বর্তমান সরকারের কোনো মাথা ব্যথা নেই। তাছাড়া জামায়াতে ইসলামী বর্তমান প্রেক্ষাপটে ক্ষমতার রাজনীতিতে ফ্যাঙ্কটর হওয়াও একটা বড় কারণ। সেই সাথে প্রতিবেশী দেশের আগ্রাসী,

আধিপত্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী ভূমিকার ক্ষেত্রে জামায়াতই প্রধান প্রতিবাদী শক্তি হওয়ার ফলেই আজ সরকারের কোপানলের শিকার হতে হচ্ছে। ১৯৯১ সালে এবং ২০০১ সালে জামায়াতের কারণে বিএনপি ক্ষমতায় আসা এবং আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় আসতে না পারাটাই জামায়াতের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের ক্ষোভের প্রথম ও প্রধান কারণ। না হলে ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী পুনর্গঠিত হওয়ার পর থেকে '৯১ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে বর্তমানে যে অভিযোগ এনেছে, সে অভিযোগ কোনোদিনই আনেনি। '৯২ সালে 'ম্বাদানিকের' মাধ্যমে জামায়াতের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক অভিযান পরিচালনার মূল কারণ ছিল, জামায়াত কেন সরকার গঠনে বিএনপিকে সমর্থন দিল? কিন্তু পরবর্তীতে কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচনের দাবিতে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে জামায়াতকে সাথে পেয়ে বা সাথে নিয়ে তাদের কোন আপত্তি তো ছিলই না, বরং অনেক তোয়াজ করে জামায়াতকে সাথে রাখার চেষ্টা করতে তাদের কোন কুণ্ঠা ছিল না। জামায়াতকে সাথে নিয়ে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী প্রেস ব্রিফিং দিতে তখন কোনো সংকোচবোধ করেননি। তাই আজ একথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা যায়, দেশের রাজনীতিতে জামায়াতের ফ্যাক্টর হওয়া এবং ভারতীয় এজেন্ডা ও ডিজাইন বাস্তবায়নের পথে প্রধান অন্তরায় হওয়াই জামায়াতের একমাত্র অপরাধ। জামায়াতের এই ভূমিকা আওয়ামী ঘরানা ও বাম ঘরানার কাছে যতই অগ্রহণযোগ্য হোক না কেন দেশবাসী এটাকে ইতিবাচকভাবেই মূল্যায়ন করবে— সেদিন বেশি দূরে নয়। অতএব কোনো মহলের প্রচারণায় বা বিভ্রান্তি ছড়ানোর কারণে ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের মনে হীনমন্যতাবোধের বা চিন্তার বিভ্রান্তির শিকার হবার প্রশ্নই ওঠে না।

ইসলামী আন্দোলনের মূল পথিকৃত শেষ নবী মুহাম্মদ (সা)। তাঁকেও আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন সময়ের, তাঁর পূর্বের নবী রাসূলদের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁর সাথী-সঙ্গীদের ছবর ও ইস্তেকামাতের সাথে ময়দানে সুদৃঢ় অবস্থান নিয়ে সামনে অগ্রসর হবার তাকিদ দিয়েছেন। বর্তমানে আল্লাহর পক্ষ থেকে নতুন করে ওহীর মাধ্যমে কোনো পথনির্দেশ আসার সুযোগ নেই। তবে ময়দানের বাস্তবতাকে সামনে রেখে কোরআন ও সিরাতে রাসূল অধ্যয়ন করলে মনের সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও হতাশা কাটিয়ে উঠে পূর্ণ আস্থা নিয়ে ময়দানে টিকে থাকার এবং সামনে এগুবার প্রেরণা পাওয়া অবশ্যই সম্ভব।

অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের ইসলাম বিরোধী শক্তির নাস্তিক্যবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেমে দ্বীন, হাজার হাজার আলেমে দ্বীনের ওস্তাদ হযরত আল্লামা আহমদ শফীর নেতৃত্বে গড়ে উঠা হেফাজতে ইসলামের রাজপথ কাঁপানো প্রতিবাদী ভূমিকা গ্রহণের পর থেকে সরকার এবং সরকারের দোসর ধর্মহীন রাজনীতির প্রবক্তা ও বাম ঘরানার রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের নানামুখী প্রচারণা ও জুলুম নির্যাতন আমাদের সকলের জন্যে একটি জীবন্ত নজির। হযরত আল্লামা আহমদ শফী এবং তাঁর সহকর্মীদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা উত্তর ৪২ বছরে আওয়ামী ঘরানা বা বাম ঘরানার পক্ষ

থেকে এমন কোনো অভিযোগ বা অপবাদ শোনা যায়নি যা বর্তমানে শোনা যাচ্ছে। কারণ একটাই এখন তারা সরকারের এবং সরকারের দোসরদের ন্যাকারজনক ইসলাম বিরোধী ভূমিকায় মাঠে-ময়দানে সরব এবং সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। ইসলামের বিরুদ্ধে, ইসলামী আন্দোলন-সংগ্রামের বিরুদ্ধে ঐ মহলবিশেষের আক্রোশ ও বিদ্বেষ মজ্জাগত। ইসলামের পক্ষে যারাই ইতিবাচক, সক্রিয় এবং শক্ত ভূমিকা রাখবে তাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের তুফান স্থায়ী করা, অত্যাচার, জুলুম, নিপীড়ন, নির্যাতনের স্টিমরোলার চালানোই তাদের ইতিহাস। কাজেই এসব দেখে ইসলামের পক্ষের লোকদের আত্মবিশ্বাস এবং আস্থা আরো বৃদ্ধি পাওয়াটাই স্বাভাবিক। এটাই ইসলামী আন্দোলনের মূলধারার যথার্থতার ও সঠিক পথে থাকার মহা সনদ, যা স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু তায়লা কর্তৃক সত্যায়িত বা অনুমোদিত।

সম্প্রতি মিশরের ঘটনার প্রতি গোটা বিশ্বের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে। মুসলিম ব্রাদারহুডকে নিষিদ্ধ করার পায়তারা চলছে। এটা হলে নাকি সেখানে ইসলামী রাজনীতি বা তাদের ভাষায় ‘রাজনৈতিক ইসলাম’ শেষ হয়ে যাবে, এই মর্মে বাংলাদেশের একটি জাতীয় দৈনিকের উপ-সম্পাদকীয় নিবন্ধে মন্তব্য করা হয়েছে। মন্তব্যকারী এই নিবন্ধ লেখার সময় মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুডকে বিগত প্রায় ৬০ বছর নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও ইসলামী আন্দোলন যা তাদের ভাষায় ‘রাজনৈতিক ইসলাম’ শেষ হয়ে যায়নি। মিসরের জনগণ ভোটাধিকার প্রয়োগের প্রথম সুযোগেই মুসলিম ব্রাদারহুড মনোনীত প্রার্থীদের সংসদে বিজয়ী করেছে, প্রেসিডেন্ট প্রার্থীকেও বিজয়ী করেছে; একইসাথে গণতন্ত্র ও ইসলামী আদর্শের জন্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। এরপর যারা মনে করে গণতন্ত্র থাকলে ইসলামের জয় সুনিশ্চিত, তারাই চক্রান্ত, ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ক্যু’দাতার মাধ্যমে প্রথমবারের মতো জনগণের ভোটে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে, গ্রেফতারও করেছে। এ প্রসঙ্গে তুরস্কের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রজব তাইয়েব এরদোগান স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন, মিসরের সামরিক ক্যু’দাতার পেছনে ইসরাইলের হাত থাকার ব্যাপারে তাদের কাছে প্রমাণ আছে। এতে প্রমাণিত হয় কোরআনে ঘোষিত ইসলাম ও মুসলমানদের কউরতম দুশমন জায়নবাদী গোষ্ঠীই তাদের পৃষ্ঠপোষকদের মাধ্যমে দেশে দেশে ইসলামের অগ্রযাত্রা রুখে দেবার অপচেষ্টা করে যাচ্ছে।

পরিশিষ্ট

রাজনৈতিক সংস্কার কৌশল*

রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনার ইতিহাস সুদীর্ঘ হলেও রাজনৈতিক দলের ইতিহাস খুব দীর্ঘ নয়। মাত্র অষ্টাদশ শতকে ইউরোপ ও আমেরিকায় রাজনৈতিক দল গঠনের সূচনা হয়। সপ্তদশ শতকে বৃটেনে হুইগ ও টোরি পার্টি জন্ম হলেও সেগুলোর তেমন প্রাতিষ্ঠানিক অবয়ব ছিল না। বৃটেনের বড় বড় ভূস্বামী ও ব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে যে গোষ্ঠী গড়ে তুলেছিল তারাই পার্লামেন্টে হুইগ ও টোরি পার্টি হিসেবে ভূমিকা পালন করে। এ সময় গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিও তেমন বিকশিত হয়নি। ভোটাধিকার সীমিত ছিল উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাবার সাথে সাথে রাজনৈতিক দলগুলোও ক্রমান্বয়ে সুশৃংখলভাবে গড়ে উঠতে থাকে। স্যার রবার্ট ফিলের নেতৃত্বে বৃটেনে ১৮৩০ সালে প্রথম কনজারভেটিভ পার্টি ক্ষমতায় আসে। পুরো অষ্টাদশ শতক জুড়ে কনজারভেটিভ পার্টি ও লিবারেল পার্টির মধ্যে ক্ষমতার লড়াই চলে। ১৯২০ সালে দিকে লিবারেল পার্টি ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়লে লেবার পার্টির বিকাশ ঘটে।

আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন রাজনৈতিক দল গঠনের বিরোধী ছিলেন। সপ্তদশ শতকের শেষদিকে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন ইস্যুতে বিতর্ক দেখা দেয়। এর ফলশ্রুতিতে দু'টো রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয়: (১) উত্তরাঞ্চলের নেতা হ্যামিলটনের নেতৃত্বে ফেডারেলিস্ট পার্টি, এরা শক্তিশালী ফেডারেল/কেন্দ্রীয় সরকারের প্রবক্তা ও আন্তর্জাতিক নীতির ক্ষেত্রে বৃটেনের সমর্থক; (২) দক্ষিণাঞ্চলের নেতা জেফারসনের নেতৃত্বে গঠিত হয় রিপাবলিকান পার্টি। এরা দুর্বল ফেডারেল/কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষপাতি এবং আন্তর্জাতিক নীতির ক্ষেত্রে ফ্রান্সের সমর্থক।

এশিয়ার মুসলিম দেশগুলোতে রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যুদয় ঘটে প্রধানত উপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সংঘবদ্ধ শক্তি হিসেবে। এদের অধিকাংশ নেতাই আবার পাশ্চাত্য দর্শনে শিক্ষিত ছিল; তবে তারা রাজনৈতিক সুবিধার জন্য মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনাকে কাজে লাগান। অবশ্য কোনো কোনো দেশে ইসলামী আদর্শকে ধারণ করেই শুরু থেকে উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনের সূচনা করেন। লক্ষণীয় যে, প্রায় প্রতিটি মুসলিম দেশেই স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ইসলামী আদর্শভিত্তিক রাজনৈতিক দল গড়ে উঠে। কিন্তু এ সকল দলের রাজনৈতিক শক্তি

* ২০০৮ সালে জামায়াতের সংস্কারপন্থীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত একটি বৈঠকে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়। ওই বৈঠকে 'রাজনৈতিক সংস্কার কৌশল' শিরোনামে এই কী-নোট পেরাপটি ছিল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। নির্ভরযোগ্য সূত্র হতে এটি সংগৃহীত।

অর্জনে যথেষ্ট সময় লেগেছে এবং তাদেরকে বহু কাঠখড় পোহাতে হয়েছে। স্বৈরশাসক ও সামরিক শাসকদের আমলে ইসলামী দলগুলো বহু নির্যাতন ও নিষিদ্ধ হওয়ার শিকার হয়।

সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন দেশের নির্বাচনী ফলাফল

২০০৮ সালের প্রথমার্ধে পাকিস্তান ও মালয়েশিয়ার সংসদ নির্বাচনে ইসলামী দলগুলো হতাশাব্যঞ্জক ভোট পেলে একজন বিশ্লেষক মন্তব্য করেন যে, এশিয়ার কোনো মুসলিম দেশে নির্বাচনে জয়লাভ করতে হলে ইসলামী এজেন্ডাকে গোপন রাখতে হবে।

মালয়েশিয়ায় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০০৮ সালের মার্চ মাসে। এতে ইসলামী দল ‘পার্টি ইসলাম-সে-মালয়েশিয়া’ (পাস)-র আসন সংখ্যা ৬ থেকে ২৩টিতে বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে ক্ষমতাসীন মহাজোটের আসন সংখ্যা বেশ কমে যায়। ১৯৬৯ সালের পর দলটির এরূপ বিপর্যয় আর ঘটেনি। মহাজোট নেতা প্রধানমন্ত্রী আবদুল্লাহ বাদাওয়ী নির্বাচনী প্রচারণায় ইসলামী উম্মাহর ঐক্যের আহ্বান জানান। পক্ষান্তরে পাস নেতারা অতীতের মত ‘ইসলামী রাষ্ট্র’ প্রতিষ্ঠার শ্লোগান না দিয়ে ‘স্বচ্ছ সরকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার’ প্রতিষ্ঠার কথা জোর দিয়ে উল্লেখ করেন। পাস নেতৃবৃন্দ আরো একধাপ এগিয়ে প্রথমবারের মত নারীদের হিয়াব বাধ্যতামূলক করার প্রতিশ্রুতি থেকে সরে আসেন এবং দলটি প্রথমবারের মত নির্বাচনে অমুসলিম ও নারীদের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেয়।

২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে পাশ্চাত্য বিশ্লেষকরা মন্তব্য করেন যে, এ নির্বাচনে পারভেজ মোশাররফের ভরাডুবি হলেও প্রকৃতপক্ষে ভরাডুবি হয়েছে ইসলামপন্থীদের। তাদের মতে, আল-কায়েদা ও তালেবানদের সাথে সম্পর্কযুক্ত ইসলামী দলগুলো ইতোপূর্বের নির্বাচনে যেখানে ১১ শতাংশ ভোট পেয়েছিল, এবারের নির্বাচনে তা কমে গিয়ে ৩ শতাংশ নেমে আসে। এর আগে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশে ইসলামী জোটের সরকার ছিল। ২০০৮ এর নির্বাচনে সেটি দখল করে নেয় সেকুলার ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি। ২০০১ সালে বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনে যেখানে ইসলামী দলগুলোর আসন সংখ্যা ছিল ২০টির উপরে এবং জোট সরকারে তাদের ২ জন মন্ত্রীও ছিল। ২০০৮ এর নির্বাচনে পার্লামেন্টে তাদের আসন সংখ্যা নেমে এসেছে মাত্র ২টিতে।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কোনো মুসলিম দেশেই পার্লামেন্ট নির্বাচনে ইসলামী দলগুলো সরকার গঠনের মত প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসন লাভ করতে পারেনি। বরং দেখা যায়, তাদের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমে আসছে। মালয়েশিয়ায় সংসদ নির্বাচন ইসলামী দলগুলো কখনোই ১১ শতাংশের বেশি ভোট পায়নি। একইভাবে ইন্দোনেশিয়ায় ইসলামী দলগুলো সবাই মিলে কখনোই ১৭ শতাংশের বেশি ভোট পায়নি। বাংলাদেশের ইসলামী দলগুলো নব্বই দশকে ১১-১২

শতাংশ ভোট পেলেও সাম্প্রতিককালে তা ৩-৪ শতাংশে নেমে এসেছে। আফগানিস্তানে তালেবান সমর্থকরা মাত্র ১১ শতাংশ ভোট পেয়েছে। অবশ্য সরকার নিয়ন্ত্রিত এ নির্বাচন কতটা অবাধ ও নিরপেক্ষ ছিল, সে প্রশ্ন রয়েছে।

কয়েক বছর আগে পাশ্চাত্য বিশ্লেষকরা মন্তব্য করেছিলেন, ইরানে সরকার মনোনীত প্রার্থীরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বলে ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে যেতে তেমন আগ্রহী হয় না। যেমন, নব্বই দশকের শেষদিকে নির্বাচনে মাত্র ৪৬ শতাংশ ভোটার ভোট দেয় এবং এতে শহুরে ভোটার ছিল মাত্র ৩০ শতাংশ। তেহরানে এই হার ছিল মাত্র ১৯ শতাংশ। কিন্তু সাম্প্রতিককালে ইরানে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও তার ফলাফল নিয়ে বিদেশী ষড়যন্ত্র এমন ভয়াবহ অভিজ্ঞতার জন্ম দেয় যা বিশ্বকে হতবাক করে দিয়েছে। এবারের নির্বাচনে ভোটারদের উপস্থিতি ৮৫ শতাংশের বেশি হওয়া এটাই ইঙ্গিত দেয় যে, ইরানের নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এটাও ইঙ্গিত দেয় যে, মুসলিম দেশগুলোতে ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলোতে পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্র ও মিডিয়ার প্রচারণা ভোটারদের বিভ্রান্ত করার জন্য সচেষ্ট থাকবে। আশার কথা যে, ইরানে অনুষ্ঠিত এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে পাশ্চাত্য যে নোংরা খেলা খেলেছে তা বুঝে যাচ্ছে এবং আহমেদী নেজাদ ও ইরানের ইসলামী সরকারের প্রতি মুসলিম দেশগুলোর সমর্থনকে দৃঢ়তর করেছে।

২০০৮ সালের নভেম্বরে জর্ডানে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ইসলামিক এ্যাকশন ফ্রন্ট এর প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা চার বছর আগের ১৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ৫ শতাংশে নেমে আসে। তারা পূর্বকার ১৭টি আসনের স্থলে মাত্র ৬টি আসন পায়।

প্যালেস্টাইনের গাজায় হামাসের জনপ্রিয়তা একেবারে তুঙ্গে। এতদসত্ত্বেও তারা ২০০৬ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ভোট পেয়েছে ৪৬ শতাংশ। তুরস্কে ইসলামপন্থী একে পার্টি ২০০৭ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ভোট পেয়েছে স্বরণকালের সর্বোচ্চ ৪৪ শতাংশ। অবশ্য তারা নির্বাচনী প্রচারণায় ইসলামী রাষ্ট্রের কথা না বলে সংবিধানে বর্ণিত সেক্যুলার নীতি অনুসরণের প্রতিশ্রুতি দেয়। তুরস্কের দেখাদেখি মরক্কোতে গঠিত হয় পার্টি অব জাস্টিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট। তারা তুরস্কের একে পার্টির বিশেষজ্ঞ পরামর্শও গ্রহণ করে। এতদসত্ত্বেও দলটি নির্বাচনে মাত্র ১০ শতাংশ ভোট পায়।

আলজেরিয়ায় দু'টি ইসলামী দল ২০০৭ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ভোট পেয়েছে মাত্র ১২ ভাগ। ইয়েমেনে গত ২০ বছর ধরে নির্বাচন হচ্ছে। সেখানকার ইসলামী দলগুলো সর্বোচ্চ ২৫ ভাগ ভোট পায়। ২০০৩ সালের নির্বাচনে তা আবার ২২ ভাগে নেমে আসে।

কুয়েতে মোটামুটি সুষ্ঠু নির্বাচনের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। ২০০৬ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সেখানকার ইসলামী দলগুলো সর্বোচ্চ ২৭ ভাগ ভোট এবং ৫০ আসনের পার্লামেন্টে

১৭টি আসন পায়। লেবাননে ২০০৫ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে দু'টি ইসলামী দল সম্মিলিতভাবে ২১ ভাগ ভোট এবং ৯২ আসনের পার্লামেন্টে ২৮টি আসন পায়।

সম্প্রতি লেবাননে অনুষ্ঠিত পার্লামেন্ট নির্বাচন ও তার ফলাফল নিয়ে পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্র ও মিডিয়ার প্রচারণা বেশ লক্ষ্যণীয়। আশা করা গিয়েছিল যে, হেজবুল্লাহর নেতৃত্বাধীন জোট জয়লাভ করবে। কিন্তু মার্কিনপন্থী সেক্যুলার জোটের জয়লাভ হতাশার জন্ম দিয়েছে। তবে এটাও শিক্ষণীয় যে, পাশ্চাত্যের ষড়যন্ত্র ও দেশীয় দালালদের কারণে নির্বাচন কাংখিত লক্ষ্যে পৌছতে পারছে না।

উল্লেখিত তথ্যগুলো থেকে প্রতীয়মান হয়, কোনো মুসলিম দেশেই ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো সরকার গঠনের মত ভালো ফল লাভ করতে পারছে না। এর কারণ গবেষণা ও অনুসন্ধানের দাবি রাখে। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ গুলের মন্তব্য: “অধিকাংশ মুসলমান সেক্যুলার রাষ্ট্রকাঠামোতে ইসলামী সমাজে বাস করতে চায়।”

তুরস্ক

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, দীর্ঘকাল যাবৎ আরব ও তুর্কী শাসকরা পারস্পরিক সহমর্মিতার ভিত্তিতে মুসলিম খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেছে। তুর্কী খলিফার দরবারে অনেক আরব আলেম ও পণ্ডিতদের প্রাধান্য ছিল; তাদের মধ্যে বিশেষ কোনো বিরোধ বা হীনমন্যতা পরিলক্ষিত হয়নি। ইউরোপের খ্রিস্টান ও ইহুদী বুদ্ধিজীবীরা অত্যন্ত সুকৌশলে আরব ও তুর্কী মুসলমানদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিষয়াদি অনুপ্রবেশ করিয়ে দেয়। প্রাচ্য ইতিহাস বিশারদ বার্নার্ড লুইস লিখেছেন, তিনজন ইউরোপীয় ইহুদী তুর্কীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের ধ্যান-ধারণার লেলিহান শিখা ছড়িয়ে দিয়েছিল। ইংরেজ ইহুদী আর্থার লুমলে ডেভিড (১৮১১-১৮৩২) ইংল্যান্ড থেকে তুরস্কে এসে Preliminary Discourses নামে একটি বই লিখেন; এতে তিনি তুর্কী জাতিকে আরবদের চেয়ে উন্নত ও স্বাধীনচেতা হিসেবে তুলে ধরেন। বইটি তরুণ তুর্কীদের মধ্যে সাড়া জাগায়। বইটি তুর্কী ভাষায় অনুবাদ করে ছড়িয়ে দেয়া হয়। ডিভিড লিয়ন কোহন নামের আরেকজন ফরাসী ইহুদী ১৮৯৯ সালে তুর্কী জাতীয়তাবাদের পক্ষে Generale a L'Histoire de L'Asie নামে একটি বই লিখেন। এতে তিনি তুর্কীদের অতীত গৌরব তুলে ধরেন। বইটি তুর্কী ভাষায় অনুবাদ করে অসংখ্য কপি বিতরণ করা হয়। ‘ইয়ং তুর্ক’ নামে খলিফার বিরোধী একটি গ্রুপকে কাজে লাগানো হয় এবং এদের সমর্থকদের নিয়ে প্যারিস ও মিশরে একটি সংগঠন গড়ে তোলা হয়। এরাই তুর্কী জাতীয়তাবাদের পক্ষে প্রচারণা চালাতে থাকে। তৃতীয় ইহুদী ব্যক্তিটি ছিল হাঙ্গেরীয় আরমিনিয়াম ভ্যাম্বারী (১৮৩২-১৯১৮)। তিনি তুর্কী ভাষা, সাহিত্য ও জাতীয় ঐতিহ্যকে দেশপ্রেমের সাথে সম্পৃক্ত করে তুলে ধরেন। তিনি সমাজের উঁচুস্তরের রাজনীতিবিদ ও ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হন এবং ক্রমাগতই তাদেরকে তুর্কী জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন।

প্রকৃতপক্ষে ইহুদীদের লক্ষ্য ছিল তাদের কাংখিত ভূমি প্যালেস্টাইন পুনরুদ্ধার করা। এ জন্য তাদের প্রাথমিক কৌশল ছিল তুর্কী খিলাফতকে ধ্বংস করে দিয়ে প্যালেস্টাইনের দিকে অগ্রসর হওয়া। তাদের দৃষ্টিতে এ কাজটি সহজ করার জন্য প্রয়োজন ছিল আরব ও তুর্কী মুসলমানদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী বিভেদ জাগিয়ে তোলা। এদের চক্রান্তের ফাঁদে পা দিয়ে নামেক কামাল, জিয়া পাশা ও জোয়াদাত পাশার মত জাতীয়তাবাদী নেতারা বিষয়টিকে উগ্রতার পর্যায়ে নিয়ে যান। অপরদিকে আরবদের মধ্যে কোনো তুর্কী বিদ্বেষ ছিল না। কিন্তু তুর্কীদের মধ্যে আরব বিদ্বেষ তীব্র হয়ে উঠলে আরবরাও তাদের জাতীয় ঐতিহ্যকে রক্ষার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠে। এরূপ সুযোগের অপেক্ষায় ছিল ইহুদী ও খ্রিস্টানরা। বৃটিশরা আরবের খ্রিস্টান মিশনারি ও পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমে আরব জাতীয়তাবাদী চেতনাকে শানিত করে তোলা। প্রথমে তারা সফল হয় মিশর, সিরিয়া, লেবানন ও জর্ডানে। বৃটেন ও ফ্রান্সের এজেন্ট নাজীব আজৌরি ১৯০৪ সালে প্যারিস থেকে আরব জাতীয়তাবাদের পক্ষে *Le Revel de La Nation Arabe* নামক এক বই লিখেন এবং প্যারিসভিত্তিক আরব জাতীয়তাবাদী সমিতি গড়ে তোলেন। তিনি একটি ম্যাগাজিনও প্রকাশ করেন।

১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলে বৃটিশরা ১৯১৬ সালে তুর্কীদের বিরুদ্ধে জর্ডানের শরীফ হোসেনকে (বাদশা হোসেনের দাদা) যুদ্ধে প্ররোচিত করে এবং সর্বাঙ্গিক সহায়তা দেয়। শরীফ হোসেন ছিল বৃটিশ এজেন্ট। তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ (বাদশা হোসেনের বাবা) বৃটিশ জেনারেল কিচনারের সাথে সংযোগ স্থাপন করেন। শরীফ হোসেন তুর্কী খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বৃটিশ সরকারী কর্মকর্তা টি.ই. লরেন্স ও প্যালেস্টাইনে নিযুক্ত বৃটিশ কমান্ডার জেনারেল এলেনবী তুর্কীদের বিরুদ্ধে আরবদের পক্ষে নেতৃত্ব দেয়। পাশ্চাত্যের ইহুদী ও খ্রিস্টানদের প্ররোচনায় আরব ও তুর্কী মুসলমানরা ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে লিপ্ত হয়। শরীফ হোসেন ও কয়েকটি আরব গুপ্ত সংগঠন বৃটিশদের সাথে চক্রান্ত করে আরব বিশ্বকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত করে। এর ফলশ্রুতিতে প্রথমেই প্রতিষ্ঠিত হয় প্যালেস্টাইনের বৃটেন উপর অবৈধ ইসরাইল রাষ্ট্র। বৃটিশরা দখলে নেয় মিশর, সাইপ্রাস, এডেন, সিরিয়া, লেবানন, ইরাক ও পারস্য উপসাগরীয় শেখ শাসিত রাজ্যগুলো। ফ্রান্স দখল করে আলজেরিয়া, তিউনিশিয়া ও মরক্কো। রাশিয়া দখলে নেয় আর্মেনিয়া। ইটালি উপনিবেশ স্থাপন করে লিবিয়ায়। তুর্কী খিলাফত একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বিশাল সাম্রাজ্য ইস্তাম্বুল ও আনাতোলিয়ার একাংশে সীমিত হয়ে পড়ে।

১৯২২ সালে তুর্কী জাতীয়তাবাদীরা গ্র্যান্ড ন্যাশনাল এসেম্বলিতে সমবেত হয়ে সুলতানের পদ বিলোপ করে। ১৯২৩ সালে তুরস্ককে প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়। কামাল পাশা দেশের প্রেসিডেন্ট হন। তিনি তুরস্কের ইসলামী ঐতিহ্যকে ধ্বংস করে ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও জীবনধারা চালু করার পদক্ষেপ নেন। আরবি ভাষাকে অফিস-আদালত ও শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বিদায় দেন। তিনি দেশে পূর্ণ স্বৈরতান্ত্রিক

শাসনব্যবস্থা চালু করেন এবং তাঁর দল রিপাবলিকান পিপলস পার্টি একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী ছিল। কামাল পাশা তুরস্ককে একটি সেকুলার (লায়েকিজম) রাষ্ট্রে পরিণত করেন। তবে ইসলামী আইন-কানুন তুর্কী সমাজে এমন শক্তভাবে শেকড় গেড়েছিল যে তা সহজে উপড়ে ফেলার উপায় ছিল না। এটা উপলব্ধি করে কামালা পাশা কতিপয় ইসলামী আইন-কানুনকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসেন। তিনি ‘দিয়ানেত’ নামক রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত একটি ধর্মীয় সংস্থা গঠন করেন। ১৯৩৭ সালে দেশটির পার্লামেন্ট যে সংবিধান অনুমোদন করে তাতে সেকুলারিজমকে (লায়েকিজম) রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। সে নীতি এখনও বহাল আছে। দেশটির সেনাবাহিনী ও সাংবিধানিক আদালত এ নীতি বহাল রাখার পক্ষে অত্যন্ত শক্ত ভূমিকা নিয়ে থাকে।

কামাল পাশা ও তাঁর দল রিপাবলিকান পিপলস পার্টি ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় দুই যুগ একদলীয় ব্যবস্থায় তুরস্কের ক্ষমতায় ছিল। ১৯৪৬ সালে দেশটিতে বহুদলীয় ব্যবস্থা চালু করা হয়। ১৯৫০ সালে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ২৪টি দলের মধ্যে অন্তত ৭টি দল রাষ্ট্র পরিচালনায় ইসলামের ভূমিকা থাকার পক্ষে অবস্থান নেয়। এই নির্বাচনে মেন্দারেসের নেতৃত্বে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি জয়লাভ করে। আদনান মেন্দারেস প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি ইসলামী মূল্যবোধ পুনরুজ্জীবিত করার জন্য মসজিদ নির্মাণসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মেন্দারেসের ইসলামপ্রীতি সেনাবাহিনী ও কামালপন্থীরা ভালো চোখে দেখেনি। কামালপন্থী ও কম্যুনিষ্টরা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। ১৯৬০ সালে দেশটির সেনাবাহিনী এক অভ্যুত্থান ঘটায় এবং মেন্দারেসের সরকারকে উৎখাত করে। মেন্দারেসকে সেকুলারিজমের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করায় মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। তাঁর দল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে নিষিদ্ধ করা হয়। এ সময় রাষ্ট্র পরিচালনায় সামরিক বাহিনীর কর্তৃত্ব বহাল রাখতে ‘জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল’ গঠন করা হয়। সেই থেকে তুরস্কের সংবিধান তথা কামালতন্ত্র ও পররাষ্ট্রনীতির সংরক্ষক হিসেবে সামরিক বাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা নিশ্চিত করা হয়।

ষাটের দশকে সামরিক সরকারের অধিকতর পাশ্চাত্যপ্রীতি তুর্কী জনগণ ভালো চোখে নেয়নি। এ সময় মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্ব বেড়ে গেলে সরকারবিরোধী মনোভাব প্রবল হতে থাকে। রাজনীতিবিদরা তাদের জাতীয় স্বকীয়তা নিয়েও প্রশ্ন উত্থাপন করতে থাকেন। লেখকরাও ইসলামী রাজনীতির পক্ষে লিখতে থাকেন। এরূপ ত্রাণ্তিকালে নাজমুদ্দিন আরবাকান নামের একজন প্রকৌশলী ইসলামী রাজনীতির প্রবক্তা হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনি প্রথমে ক্ষমতাসীন জাস্টিস পার্টিতে যোগ দেন। ঐ দলে নেতৃত্বের লড়াইয়ে টিকতে না পেরে তিনি ১৯৭০ সালে মিল্লি নিজাম পার্টি (ন্যাশনাল অর্ডার পার্টি) গঠন করেন। এ সময় বিরোধী দলগুলো সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার করে।

১৯৭১ সালে দেশটিতে দ্বিতীয় দফা সামরিক শাসন জারী হয়। সামরিক সরকার সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এক বছর পরে আরবাকান মিল্লি সালামত পার্টি (ন্যাশনাল স্যালভেশন পার্টি) নামে নতুন দল গঠন করেন। ১৯৭৩ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে এ দলটি অপ্রত্যাশিতভাবে প্রায় ১২ ভাগ ভোট পেয়ে পার্লামেন্টে তৃতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কোন দলই নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। ফলে কোয়ালিশন সরকার ছিল অবধারিত। এ সময় একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটলো। আরবাকানের মিল্লি সালামত পার্টি ও ইসলামের প্রতি উদার সুলেমান ডেমিরেলের এপি পার্টির মধ্যে সমঝোতা হলো না। বরং কামালপন্থী বুলেন্দ এসিভিটের রিপাবলিকান পার্টি আরবাকানকে সরকার গঠনে সমর্থন দেয়। আরবাকানের সরকার ১৯৭৪ সালে ১১ মাস ক্ষমতায় ছিল। আরবাকান পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য বিরোধী অবস্থান নেন। মেন্দারেসের মতো তিনিও ইসলামী মূল্যবোধ পুনরুজ্জীবিত করার জন্য মসজিদ নির্মাণসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৮০ সাল পর্যন্ত তুরস্কে বার বার ক্ষমতার পটপরিবর্তন হয়। পুরো সত্তর দশক জুড়ে তুরস্কে ডানপন্থী, বামপন্থী ও ইসলামপন্থীদের মধ্যে মারাত্মক কলহ-বিবাদের ফলশ্রুতিতে ১৯৭৯ ও ১৯৮০ সালেই প্রায় ৩ হাজার রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটে। এ সুযোগে সামরিক বাহিনী ১৯৮০ সালে আবার ক্ষমতা দখল করে। সামরিক সরকার পার্লামেন্ট ভেংগে দেয় এবং সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। প্রায় ৬ লক্ষ ৫০ হাজার রাজনৈতিক নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয় এবং ৫১৭ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। ৩ লক্ষ ৮৮ হাজার লোককে বিদেশ যেতে বাধ্য দেয়া হয়। অপরদিকে ৩০ হাজার রাজনৈতিক কর্মীকে তুরস্ক থেকে বহিস্কার করা হয়। ১৪ হাজার তুর্কী নাগরিকের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়। হাজার হাজার সরকারী কর্মচারীর চাকরীহরণ করা হয়। ৬ শতাধিক ক্লাব/সমিতি বন্ধ করে দেয়া হয়।

সামরিক সরকার চরম নির্যাতনের পর নির্বাচনের দিকে অগ্রসর হয়। ১৯৮৩ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে তুরগুত ওজালের নেতৃত্বে মাদারল্যান্ড পার্টি ৪৫ ভাগ ভোট পেয়ে জয়লাভ করে। তিনি ইসলামের প্রতি উদার ছিলেন। প্রজাতন্ত্র ঘোষণার পর তিনি হচ্ছেন তুরস্কের প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি ১৯৮৮ সালে মক্কায় গমন করে পবিত্র হজ্জ সম্পাদন করেন। তাঁর আমলে ইসলামী মূল্যবোধ পুনরুজ্জীবিত করার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। তিনি ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী এবং এরপর ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ থাকলেও আরবাকান ১৯৮৩ সালে গোপনে রাফাহ পার্টি নামে একটি নতুন দল গঠন করে রেখেছিলেন। ১৯৮৭ সালে এক রেফারেন্ডামের ফলে রাজনৈতিক দলগুলো পুনরুজ্জীবিত হয়। এ সময় (১৯৮৭) অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তুরগুত ওজালের মাদারল্যান্ড পার্টি ৩৬ ভাগ ভোট পেয়ে পুনরায় জয়লাভ করে। ১৯৮৩ সালে অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকার নির্বাচনে রাফাহ পার্টি বেশ ভালো ফল করে। আরবাকানের

পার্টি নতুন আত্মবিশ্বাসে এগুতে থাকে। সত্তর দশকে আরবাকানের পার্টি ছিল অনেকটা প্রাদেশিক ধাঁচের; কিন্তু নব্বই দশকে সে দলটি একটি আধুনিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জাতীয় দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। দলটি গতানুগতিক ইসলামী নীতির পরিবর্তে ‘জাস্ট অর্ডার’ শ্লোগান দিয়ে ভোটারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে রাফাহ পার্টি ২১.৪ শতাংশ ভোট পেয়ে ১৫৮টি আসনে (৫৫০টির মধ্যে) জয়লাভ করে। রাফাহ পার্টির এরূপ জয়লাভের পেছনে কারণ কী? বিশ্লেষকদের মতে, কুদী সমস্যা সমাধানে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের নীতি গ্রহণ, নারী সমাজের ব্যাপক সমর্থন, শহুরে দরিদ্রদের পুনর্বাসনের আশ্বাস ও সমাজসেবামূলক কাজ ইত্যাদি কারণে দলটির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। তারা সততা ও নৈতিকতার প্রতি জোর দেয়। এছাড়া ইস্তামুল ও আঙ্কারা নগরীর নির্বাচিত মেয়রদ্বয় ছিলেন এ দলের। যারা ব্যাপক নাগরিক সুযোগ-সুবিধামূলক কর্মকাণ্ড দ্বারা বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন।

রাফাহ পার্টির প্রাপ্ত ১৫৮টি আসন সরকার গঠনের জন্য যথেষ্ট ছিল না। তানসু সেলারের ট্রু পাথ পার্টির সমর্থন নিয়ে ১৯৯৬ সালে আরবাকান সরকার গঠন করেন। কিন্তু সিলারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অনেক অভিযোগ ছিল। আরবাকান নির্বাচনের আগে অধিকতর ইসলামীকরণের কথা বললেও ক্ষমতায় গিয়ে উদার নীতি গ্রহণ করেন। তথাপি তিনি অনেক ক্ষেত্রে ইসলামীকরণের কাজ হাতে নেন। কিন্তু তা দলের নেতাকর্মীদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তারা বিভিন্ন নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থতার অভিযোগ আনে। ক্ষমতায় আরোহণের কয়েক মাসের মাথায় আরবাকানের সরকার কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। কোয়ালিশন সরকারের অংশীদার তানসু সিলারের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ তদন্তের বিষয়টি পার্লামেন্টারি কমিটি বার বার আটকে দিচ্ছিল। বিরোধী দল এর কঠোর সমালোচনা করে। আরবাকান নিজ দলের মধ্যেও সমালোচনার সমুখীন হন। ১৯৯৭ সালের দিকে দলের নেতাকর্মীরা ইরানী স্টাইলে বিপ্লবের দাবি জানায়। বিষয়টি সামরিক বাহিনী, প্রেসিডেন্ট ও সিভিল সোসাইটি— এই তিন শক্তিকে উত্তেজিত করে তোলে। সামরিক বাহিনী আরবাকানকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগের জন্য চাপ দিতে থাকে। সেনাবাহিনীর চাপে ট্রু পাথ পার্টির সদস্যরা পার্লামেন্ট থেকে পদত্যাগ করে। ফলে আরবাকান সরকার পার্লামেন্টের আস্থা হারান এবং পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ১৯৯৭ সালের ৩০ জুন আরবাকানের নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশন সরকারের পতন ঘটে। ১৯৯৮ সালে তুর্কী সাংবিধানিক আদালত রাফাহ পার্টিকে সেক্যুলার নীতি ভংগের দায়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। রাফাহ পার্টির নেতা-কর্মীরা বিকল্প পথে ভারচু পার্টি নামে আরেকটি দল গঠন করে। তারা ১৯৯৯ সালে নির্বাচনে অংশ নিয়ে ১৫.৪ শতাংশ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থান দখল করে এবং পার্লামেন্টে বিরোধী দলের আসনে বসে। রাফাহ পার্টির নবতর সংস্করণ হচ্ছে ভারচু পার্টি— এ অভিযোগে ২০০১ সালে এ দলটিকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

নানা কারণে আরবাকান সরকারের ব্যর্থতার পাশাপাশি বার বার দল নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে পার্টির নেতাকর্মীদের মধ্যে দলের কৌশল গ্রহণ প্রশ্নে মতবিরোধ দেখা দেয়। আরবাকান ক্রমান্বয়ে দলে কোনঠাসা হয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে দলে বিভক্তি দেখা দেয়। আরবাকান সমর্থক পুরানো ধাঁচের নেতৃত্ব সংঘবদ্ধ হয়ে গঠন করে ফেলিসিটি পার্টি এবং সংস্কারবাদীরা গড়ে তোলে জাস্টিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি (একে পার্টি)। পার্লামেন্টে রাফাহ পার্টির ৪৮ জন ফেলিসিটি পার্টিতে এবং ৫৩ জন একে পার্টিতে যোগ দেন। ইস্তাম্বুলের মেয়র রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান একে পার্টির নেতা নির্বাচিত হন।

একে পার্টি নতুন উদ্যমে যাত্রা শুরু করে। তারা তুর্কী সেক্যুলার নীতি, পাশ্চাত্যমুখী পররাষ্ট্র নীতি, ইইউ ও ন্যাটো জোটে অংশগ্রহণ ও মুক্তবাজার নীতি অনুসরণের ঘোষণা দেয়। তাদের নতুন কৌশল বেশ কাজ দিল। ১৯৯৯ সালে নির্বাচনে অংশ নিয়ে দলটি ৩৪.৩ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়লাভ করে। তারা পার্লামেন্টের ৫৫০ টি আসনের মধ্যে ৩৬৩ টি আসন লাভ করে যা দুই-তৃতীয়াংশের কাছাকাছি। আরবাকানের ফেলিসিটি পার্টি মাত্র ২.৫ শতাংশ ভোট পায়। এ সময় বিরোধী দলের সম্মিলিত ভোট ছিল প্রায় ৫৩.৪ শতাংশ। তারা এরদোগান সরকারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ এনে আন্দোলন করলেও ২০০২ সালে নির্বাচনে জনগণ পুনরায় একে পার্টিকে বিজয়ী করে। বিরোধী দলের সম্মিলিত ভোট কমে দাঁড়ায় ১৪.৬ শতাংশে। নতুন ও তরুণ ভোটার, গরীব জনগোষ্ঠী ও কুর্দীরা একে পার্টিকে ভোট দেয়।

মিশর

১৮৮১ সালে মিশর ব্রিটিশ উপনিবেশের অধীনে চলে যাবার আশংকা দেখা দেয়। এ সময় প্রধানমন্ত্রী শরীফ পাশার নেতৃত্বে গঠিত হয় আল-হিবুল ওয়াতানী (জাতীয়তাবাদী দল)। ১৮৮২ সালে বৃটেন ও ফ্রান্স মিশর দখল করে নেয়। উপনিবেশিক শাসকরা ক্ষমতা দখল করে জাতীয়তাবাদী নেতাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়। ১৯১৭ সালে মোস্তফা কামাল নামক একজন আইনজীবীর নেতৃত্বে গঠিত হয় ন্যাশনাল পার্টি। ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধে বৃটেন মুসলিম খিলাফতের কেন্দ্র তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং মিশরকে আশ্রিত রাজ্য হিসেবে গন্য করে। এ সময় মিশরের জনগণের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী ক্ষোভ ধুমায়িত হতে থাকে। আরেক জাতীয়তাবাদী নেতা সা'দ জগলুল পাশার নেতৃত্বে মিশরে স্বাধীনতা আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠলে ব্রিটিশ সরকার ১৯২২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়। ১৯২৩ সালে সংবিধান গৃহীত হয় এবং এর আওতায় মিশরে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র ও বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করা হয়। ১৯২৭ সালে অনুষ্ঠিত হয় নির্বাচন এবং এতে সা'দ জগলুল পাশার নেতৃত্বে ওয়াফদ পার্টি জয়লাভ করে।

মিশরে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যখন নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল তার এক পর্যায়ে ১৯৫২ সালে দেশটিতে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। সামরিক সরকারের

ছত্রছায়ায় গঠিত হয় লিবাবেল র্যালি পার্টি। এ দলের ব্যানারে দীর্ঘদিন সামরিক সরকারের একদলীয় শাসন চলে। ১৯৭৭ সালে সরকারের এক আদেশে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনরায় চালু করা হয়। ১৯৭৭ সাল থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪০টি ছোটবড় রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। উপনিবেশিক আমল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ৭/৮ টি রাজনৈতিক দল গঠিত হলেও কালক্রমে সেগুলো টিকে থাকতে পারেনি। কোনো কোনোটি আবার নাম পরিবর্তন করে নতুন নামে আত্মপ্রকাশ করেছে। যেমন ১৯২৮ সালে হাসানুল বান্নার নেতৃত্বে গঠিত ইখওয়ানুল মুসলেমীন (মুসলিম ব্রাদারহুড) রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে সক্রিয় ছিল।

বলাই বাহুল্য যে, মিশরে ১৮৫০-১৯৫২ সাল পর্যন্ত উপনিবেশিক ও রাজতান্ত্রিক শাসন, ১৯৫৩-১৯৫৮ সাল পর্যন্ত সামরিক শাসন ও ১৯৫৭-১৯৭৭ সাল পর্যন্ত কর্নেল জামাল নাসেরের নেতৃত্বে একদলীয় শাসন এবং ১৯৭৭ সাল থেকে অদ্যাবধি নিয়ন্ত্রিত বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু রয়েছে। ১৯৭৭ সালের সংবিধান অনুযায়ী দেশটিতে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠন নিষিদ্ধ। অবশ্য সংবিধানে আইনের অন্যতম উৎস হিসেবে কোরআন ও সুন্নাহকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। ইখওয়ানুল মুসলেমীন (মুসলিম ব্রাদারহুড) ছাড়াও কেফায়া আন্দোলনসহ কোনো কোনো ইসলামী দল বিভিন্ন নামে সরকারের প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে সক্রিয় রয়েছে। মুসলিম ব্রাদারহুডের স্বেচ্ছাসেবকরা ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সরকারী বাহিনীর চাইতে বেশি বীরত্ব প্রদর্শন করে। রাজা ফারুকের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রামে এবং সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে মুসলিম ব্রাদারহুডের নেতাকর্মীরা ছিল অগ্রগামী। নানাবিধ সমাজকল্যাণমূলক কাজ করে দলটি জনগণের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ১৯৪৯ সালে ব্রাদারহুডের নেতা হাসানুল বান্না আততায়ীর হাতে নিহত হন। ১৯৫২ সালে রাজা ফারুকের বিরুদ্ধে জেনারেল নাজীব ও কর্নেল জামাল নাসেরের নেতৃত্বে দেশটিতে সামরিক অভ্যুত্থান হলে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে।

সামরিক সরকার প্রথমদিকে কিছু ভালো কাজ করলেও অচিরেই তাদের নানা কর্মকাণ্ড সমালোচনার বিষয়ে পরিণত হয়। নাজীব ও নাসেরের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে মুসলিম ব্রাদারহুডের নেতাকর্মীরা সক্রিয় হয়ে উঠে। তাদের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে জামাল নাসের দলটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে যা আজও অব্যাহত আছে। এরপর থেকে দলটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে কাজ চালাচ্ছে। তারা দেশের জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অন্য দলের নামে বা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে অংশ নিচ্ছে।

সাম্প্রতিককালে ২০০৫ সালের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের নির্বাচনে ব্রাদারহুডের নেতাকর্মীরা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে বিপুল বিজয় লাভ করে। মোট ৪৪০টি আসনের এক-পঞ্চমাংশ তথা ৮৮টি আসনে তারা বিজয়ী হয়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে নির্বাচন

অবাধ ও নিরপেক্ষ হলে তারা আরো অনেক বেশি আসনে জয়ী হতো। ব্রাদারহুডের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে হুসনে মোবারক সরকার দলটির নেতাকর্মীদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন ও হয়রানির মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেয়। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি অনেক নেতাকর্মীকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের অযোগ্য ঘোষণা করা হয়।

২০০৬ সালের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সরকার মারাত্মক জোর-জবরদস্তির আশ্রয় নেয়। মোট ৫২০০০ আসনের মধ্যে ৮০ ভাগ আসনে তারা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়। বিরোধী দলগুলোকে দেয়া হয় মাত্র ১০০০টি আসন। পর্যবেক্ষকদের মতে এ নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি ছিল মাত্র ৫ ভাগ বা তারও কম। ২০০৮ সালের নির্বাচনে সরকারী অত্যাচার-নির্যাতনের প্রতিবাদে ব্রাদারহুড পৌরসভা নির্বাচন বয়কট করে।

মিশরে বর্তমানে (২০০৮) বৈধ ২৪টি রাজনৈতিক দল থাকলেও তারা সরকারী দমন-নীতির কারণে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। পার্লামেন্টে মাত্র ৪টি বিরোধী দলের মাত্র ১৬টি আসন রয়েছে। স্বতন্ত্র ১১২টি আসনের মধ্যে ব্রাদারহুডের সমর্থক আছেন ৮৮ জন। সাম্প্রতিককালে ব্রাদারহুডের প্রায় ৪০ জন নেতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ এনে তাদেরকে সামরিক আদালতে বিচারের সম্মুখীন করেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মিশরে প্রকৃত গণতন্ত্রের চর্চা তথা নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হলে ব্রাদারহুডের বিপুল বিজয়কে ঠিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। তবে মার্কিন সমর্থিত হুসনে মোবারক সরকার দমন নীতির মাধ্যমে কতদিন ক্ষমতায় থাকবে তা বলা কঠিন।

মালয়েশিয়া

১৮৬৭ সাল থেকে বৃটিশ উপনিবেশিক শক্তি মালয়েশিয়া শাসন করা শুরু করে এবং ক্রমাগতই তা সম্প্রসারিত হতে থাকে। মালয়েশিয়ানরা ১৮৭৬ সাল থেকে বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের সূচনা করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪১ সালে জাপান মালয়েশিয়া দখল করে নেয়। বৃটিশ শাসকদের সহায়তায় গঠিত কম্যুনিষ্ট পার্টি (প্রধানত চীনা বংশোদ্ভূত) জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে। জাপানও তাদের সমর্থক গোষ্ঠী গড়ে তোলার চেষ্টা করে। ১৯৪৫ সালে বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত হয়ে জাপান আত্মসমর্পণ করে এবং মালয়েশিয়ায় অভ্যন্তরীণভাবে মারাত্মক বিশৃংখলা দেখা দেয়। এ সময় মালয়েশিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টি ক্ষমতা গ্রহণের চেষ্টা করে এবং অধিকন্তু তারা জাপান সমর্থক মালয়দের উপর চরম নির্যাতন চালায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে চীন ও মালয়দের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘাত দেখা দেয়। বৃটিশ সরকার কম্যুনিষ্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করে।

১৯৪৬ সালের দিকে বৃটিশ সরকার মালয়েশিয়ার স্বশাসনের প্রস্তাব দিলে তা বিবেচনার জন্য মালয়েশিয়ার প্রায় ৪১টি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন একত্রিত হয়ে ইউনাইটেড মালয়েজ ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন (ইউমনো) নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে। ১৯৪৮ সালে মালয়, সাবাহ, সারওয়াক ও সিংগাপুর নিয়ে গঠিত হয়

মালয় ফেডারেশন। উপনিবেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণে পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫১ সালে অনুষ্ঠিত হয় পৌরসভা নির্বাচন। এ নির্বাচনে ইউমনো ও মালয় চাইনিজ এসোসিয়েশন যৌথভাবে ১২টি আসনের মধ্যে ৯টি আসন লাভ করে। নিবাচনী ফলাফলে উৎসাহিত হয়ে এ দু'টি সংগঠন বৃহত্তর রাজনৈতিক জোট গঠনের উদ্যোগ নেয়। পরবর্তীতে মালয় ইন্ডিয়ান কংগ্রেসও জোটে যোগ দেয়। এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন টেংকু আবদুর রহমান। নতুন রাজনৈতিক জোট স্বাধীনতা লাভ ও বিভিন্ন দাবি আদায়ের জন্য বৃটিশ সরকারের সাথে দেনদরবার চালাতে থাকে। ১৯৫৫ সালে অনুষ্ঠিত হয় ফেডারেল নির্বাচন। এতে জোট ৫২টি আসনের মধ্যে ৫১টিতেই জয়লাভ করে। একমাত্র ইসলামী দল প্যান-মালয়ান ইসলামিক পার্টি মাত্র ১টি আসন পায়। ১৯৫৭ সালের ৩১ আগস্ট বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে মালয়েশিয়া স্বাধীনতা লাভ করে। সংবিধান অনুযায়ী দেশে পার্লামেন্টারি রাজনৈতিক পদ্ধতি চালু হয়। টেংকু আবদুর রহমান দেশটির প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত ইউনাইটেড মালয়েজ ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন (ইউমনো) নেতৃত্বাধীন ১৩ দলীয় মহাজোট বরিসান ন্যাশনাল (গ্রান্ড কোয়ালিশন) মালয়েশিয়ার প্রতিটি নির্বাচনে জয়লাভ করে এবং সরকার গঠন করে। গ্রান্ড কোয়ালিশনের নেতৃত্ব দেন ডা. মাহাথির মোহাম্মদ। তিনি দীর্ঘদিন সরকারের নেতৃত্ব দিয়ে দেশটিকে অর্থনৈতিকভাবে উন্নয়নশীল দেশের সামনের কাতারে নিয়ে যেতে সক্ষম হন। মাহাথির পাশ্চাত্যের কঠোর সমালোচক ও উন্নয়নশীল বিশ্বের স্বার্থের পক্ষে একজন জোরালো প্রবক্তা হিসেবে বিশ্বে আলোচিত ব্যক্তিতে পরিণত হন। ২০০১ সালে তিনি ক্ষমতার ২০ বছর পূর্তি পালন করেন। দেশটিতে ১৯৫৭ সাল থেকে নির্ধারিত সময় অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান ও শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর হলেও ক্ষমতাসীনদের কর্তৃত্ববাদী মানসিকতা ও কর্মকাণ্ড গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির সহায়ক নয় বলে মনে করেন বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। কারো কারো মতে, মালয়েশিয়ার রাজনৈতিক পদ্ধতিটি পুরোপুরি গণতান্ত্রিক নয়; বরং আধা-কর্তৃত্ববাদী (semi-authoritarian), আধা-গণতান্ত্রিক (semi-democratic or quasi-democratic)। জেসুডাসন নামক একজন বিশ্লেষক দেশটিকে syncretic-state নামে আখ্যায়িত করেন।

উল্লেখ্য, মালয়েশিয়ার জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৬৫ শতাংশ মালয়ী (ভূমিপুত্র) যাদের সকলেই মুসলমান, ২৬ শতাংশ চীনা বংশোদ্ভূত, ৮ শতাংশ ভারতীয় বংশোদ্ভূত এবং ১ শতাংশ অন্যান্য নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী। মহাজোট তিনটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সাফল্যের সাথে সম্প্রীতি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। তবে পাশাপাশি পশ্চাৎপদ সংখ্যাগরিষ্ঠ মালয় মুসলিমদের স্বার্থরক্ষা ও তাদের অধিকতর উন্নয়নের জন্য সরকার বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। ডা. মাহাথির ও তাঁর উত্তরসূরি আবদুল্লাহ বাদাবি উভয়ই ইসলামী মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যকে সমুল্লত করার দৃঢ়নীতি অনুসরণ করেন। তারা আধুনিকতা, শিল্পায়ন ও ইসলামী শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধনের কৌশল গ্রহণ করেন।

ইসলামিক পার্টি অব মালয়েশিয়া (পাস) দেশটির প্রধান ইসলামী রাজনৈতিক দল। ছাত্র ও যুবকদের মধ্যেও ইসলামী সংগঠনের তৎপরতা রয়েছে। ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী যুব সংগঠন আংকাতান বেলিয়া ইসলাম মালয়েশিয়া (আবিম)-এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আনোয়ার ইব্রাহিম। একজন পার্লামেন্ট সদস্যের পুত্র আনোয়ার ইব্রাহিম তাঁর প্রতিভা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যে দারুণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে মাহাথির তাঁকে সরকারে অন্তর্ভুক্ত করেন। আনোয়ার তাঁর যোগ্যতা ও দক্ষতা দ্বারা একে একে অর্থমন্ত্রী ও উপপ্রধানমন্ত্রী পদে পৌঁছে যান। মাহাথির তাঁকে নিজের উত্তরসূরি হিসেবে বিবেচনা করতে থাকেন। কিন্তু কিছু কিছু নীতিগত বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী মাহাথিরের সাথে তাঁর মতপার্থক্য দেখা দিলে ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বরে তাঁকে উপপ্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও সমকামিতার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়। আনোয়ার বলেন, মতপার্থক্য ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার জন্য তাঁকে অপসারণ করা হয়। ভিন্ন ভিন্ন আদালত তাঁকে ১৯৯৯ ও ২০০০ সালে বিভিন্ন দফায় মোট ৯ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়।

১৯৯৯ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত পার্লামেন্ট নির্বাচনে মহাজোট পুনরায় ক্ষমতাসীন হয়। তবে তাদের আসন সংখ্যা পূর্বের ৯৪ থেকে ৭২টিতে নেমে আসে। অপরদিকে ইসলামী দল পাস এর আসন সংখ্যা ৪২টিতে বৃদ্ধি পায়। দলটি পূর্বের মত কেলাংতান প্রদেশে ক্ষমতা ধরে রাখে এবং অধিকন্তু তেরেঙানু প্রদেশেও সরকার গঠনে সক্ষম হয়। ২০০৩ সালে মাহাথীর রাজনীতি থেকে বিদায় নেন। ২০০৪ সালে অনুষ্ঠিত পার্লামেন্ট নির্বাচনেও মহাজোট পুনরায় ক্ষমতাসীন হয়। এবারে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতার পাশাপাশি তেরেঙানু প্রদেশেও ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে। জোট এ নির্বাচনে অবিশ্বাস্যভাবে ৯২ শতাংশ ভোট পায়। এরূপ নিরংকুশ বিজয়ে মাহাথির বলেন,

“I believe the country should have a strong government, but not too strong. A two-third majority like I enjoyed when I was Prime Minister is sufficient; a 90% majority is too strong... we need an opposition to remind us if we are making mistakes. When you are not opposed you think everything you do is right.”

বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও মহাজোটের বিরুদ্ধে নির্বাচনে কারচুপি, দুর্নীতি, অর্থনৈতিক সংকট বিশেষত মুদ্রাস্ফীতি, অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি ও জাতিগত উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা ইত্যাদি অভিযোগে বিরোধী দলগুলো আন্দোলন ও প্রতিবাদ গড়ে তোলে। আনোয়ার ইব্রাহিমের স্ত্রী আজিজার নেতৃত্বে গঠিত হয় পিপলস জাস্টিস পার্টি।

২০০৬ সালে আনোয়ার ইব্রাহিম কারাগার থেকে বেরিয়ে আসেন এবং সরকার বিরোধী আন্দোলন জোরদার করেন। ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত পার্লামেন্ট নির্বাচনে মহাজোটের বিরাট বিপর্যয় ঘটে। কোনোভাবে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখতে পারলেও ১২টি

রাজ্যসভার ৫টি চলে যায় বিরোধী দলের হাতে। ইসলামী দল পাস এর আসন সংখ্যা আবার বৃদ্ধি পায়। আনোয়ার ইব্রাহিম প্রথমে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে না পারলেও পরবর্তীতে উপনির্বাচনে জোটের শক্তিশালী প্রার্থীকে ১৬ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। আনোয়ার রাজনীতিতে পুরোদমে পুনর্বাসিত হন। উল্লেখ্য যে, মালয়েশিয়ার ইসলামী দলগুলো ক্রমান্বয়ে ভালো করলেও তারা কিন্তু সরাসরি ইসলামী রাষ্ট্রের কথা না বলে ‘সুশাসন’ ও ‘ন্যায়বিচার’ প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি জোরের সাথে উল্লেখ করেন।

ইন্দোনেশিয়া

ইন্দোনেশিয়ার আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি দেশজ ও বাহ্যিক উপাদান যেমন; ধর্ম, উপনিবেশিকতা, জাতীয়তাবাদী চেতনা ইত্যাদি সংমিশ্রণে বিকশিত হচ্ছে। ১৭৯৯ সালে ডাচরা দেশটির শাসনভার দখল করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও সময় জাপান ইন্দোনেশিয়ার উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৪৫ সালে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে জাপান আত্মসমর্পণ করলে জাতীয়তাবাদী নেতা ড. সুকর্ন ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পার্লামেন্টারি পদ্ধতির রাজনৈতিক ব্যবস্থার কথা বলে যাত্রা শুরু করলেও সুকর্ন ১৯৫৯ সালে তথাকথিত ‘নির্দেশিত গণতন্ত্র’ চালু করেন। স্বাধীনতার পর থেকেই এ অঞ্চলে কম্যুনিষ্ট মতাদর্শের বিস্তার রোধে যুক্তরাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়াকে সামরিক ও আর্থিক সাহায্য দিয়ে আসছিল।

১৯৬৫ সালে জেনারেল সুহার্তো কম্যুনিষ্ট অভ্যুত্থান প্রতিহত করার কথা বলে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করেন। তিনি দীর্ঘ ৩৩ বছর একচ্ছত্র ও স্বৈরাচারী কায়দায় দেশ শাসন করেন। তাঁর আমলে রাজনৈতিক নিপীড়ন এত বেশি ঘটে যে, বলা হয়ে থাকে, তিনি প্রায় ১০ লক্ষ রাজনৈতিক কর্মীকে হত্যা করেন। অবশেষে ১৯৯৮ সালে তিনি গণআন্দোলনের মুখে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এরপর বিজে হাবিবি (১৯৯৮-৯৯), আবদুর রহমান ওয়াহিদ (১৯৯৯-২০০১) ও মেঘবতী সুকর্নপুত্রী (২০০১-০৪) প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৫ সালে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করেন সুসিলো বামবাং। সামরিক বাহিনী সমর্থিত গোলকার পার্টি তাঁকে সমর্থন দেয়।

তিনটি প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান নিয়ে ইন্দোনেশিয়ার আইনসভা গঠিত: (১) ৫৫০ সদস্য বিশিষ্ট হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ, (২) ১২৮ সদস্য বিশিষ্ট রিজিওনাল রিপ্রেজেন্টেটিভ কাউন্সিল, ও (৩) উক্ত দু’টো সংস্থার প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত পিপলস কনসালটেটিভ এসেম্বলী। শেষোক্ত সংস্থাটি সংবিধান সংশোধন ও প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে অনাস্ত্র বিষয় বিবেচনা করে।

ইন্দোনেশিয়ার সামরিক বাহিনী দেশটির রাজনীতিতে অত্যন্ত প্রভাবশালী ও ক্ষমতাধর প্রতিষ্ঠান। এমনকি পার্লামেন্টেও তাদের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ

প্রক্রিয়ায় সামরিক বাহিনীকে উপেক্ষা করা কঠিন। দেশটির রাজনীতি ও সমাজ জীবনে ঐতিহাসিকভাবে ইসলামী মূল্যবোধের একটি বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব রয়েছে। উপনিবেশিক আমলে ১৯১২ সালে মোহাম্মদীয়া পার্টি ও ১৯২২ সালে নাহদাতুল উলেমা পার্টি গঠিত হয়। এ দু'টো সংগঠনেরই বহু শাখা-প্রশাখা ও জনপ্রিয়তা ছিল। আধুনিক শিক্ষিত লোকদের ইসলামী পার্টি ছিল মাসজুমী পার্টি। ১৯৫৯ সালে মাসজুমী পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

সাম্প্রতিককালে ইন্দোনেশিয়ায় ইসলামী চেতনার ক্রমবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পিকেএম জাস্টিস পার্টি ইসলামী দল হিসেবে ভোটারদের মধ্যে কিছু জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ১৯৯৯ সালের নির্বাচনে এ দলটি মাত্র ১টি আসন পায়। ২০০৪ সালে অনুষ্ঠিত পার্লামেন্ট নির্বাচনে এ দলটি ২০ ভাগ ভোট পেয়ে ৪৫টি আসন লাভ করে। এ নির্বাচনে তারা ইসলামী রাষ্ট্রের কথা না বলে সুশাসনের প্রতি বেশি জোর দিয়েছিল। ২০০৬ সালের নির্বাচনে তাদের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ৯ শতাংশে নেমে আসে। ২০০৬ সালে পরিচালিত এক জনমত জরিপে দেখা যায়, দেশটির ৪৩ ভাগ ভোটার সেক্যুলার পার্টিকে সমর্থন করে। মাত্র ৫ ভাগ ভোটার ইসলামী শাসন চায়। ইন্দোনেশিয়ায় অন্যান্য ইসলামী দলের মধ্যে রয়েছে: হিবুত তাহরীর ও ইসলামিক ডিফেন্ডারস ফ্রন্ট। দু'টো দলই বেশ সক্রিয়।

সুদান

১৮২১ সালে মিশর সুদান দখল করে। পরবর্তীতে মিশর ও বৃটেন যৌথভাবে দীর্ঘদিন দেশটি শাসন করে। ১৮৮১ সালে মুহাম্মদ আহমদ নামে একজন সুদানী মুসলিমের নেতৃত্বে দেশটির জনগণ মিশর ও বৃটেনের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এরপর ১৯৪০-১৯৫২ সালের সময়কালে সুদানের স্বাধীনতা আন্দোলন বেগবান হয়। ১৯৫৬ সালের ১ জানুয়ারী মিশর ও বৃটেন সুদানের স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়। স্বাধীনতা আন্দোলন ও পরবর্তীকালে দেশটিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গঠিত হয়েছিল। মাত্র দুই বছরের ব্যবধানে জেনারেল ইব্রাহিমের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে এবং সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৬৪ সালে গণআন্দোলনের ফলে রাজনৈতিক নেতৃত্ব পুনরায় রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পায়।

মাত্র ৫ বছরের ব্যবধানে আবার ১৯৬৯ সালে জেনারেল জাফর নিমেরীর নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে। তিনিও সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। নিমেরী ১৯৭১ সালে দেশটির প্রেসিডেন্ট হন। ১৯৭৩ সালে সুদানের প্রথম সংবিধান গৃহীত হয়। এতে প্রেসিডেন্টকে প্রভূত ক্ষমতা দেয়া হয়। মাত্র একটি রাজনৈতিক দল অনুমোদন পায়। সেটি সুদানী সোসালিস্ট ইউনিয়ন এবং প্রেসিডেন্ট নিমেরী নিজেই তার প্রধান হন। বেশ কয়েকটি ইসলামী রাজনৈতিক দল সক্রিয় ছিল। তাদের তৎপরতায় নিমেরী ইসলামপন্থীদের সমর্থন লাভের জন্য দেশে শরীয়াহ আইন

চালু করার উদ্যোগ নেন। পাশাপাশি তিনি প্রাদেশিক সরকার পদ্ধতি বাতিল করে দেন। দক্ষিণাঞ্চলের খ্রিস্টানরা এর বিরোধিতা করে।

১৯৮৫ সালে জেনারেল আবদুল রহমান আলদাহার আরেকটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করেন। তিনি পার্লামেন্টারি পদ্ধতি বাতিল ও সোসালিস্ট ইউনিয়ন পার্টিকে নিষিদ্ধ করেন। তিনি রাষ্ট্র পরিচালনায় রাজনৈতিক নেতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত হয় পার্লামেন্ট নির্বাচন। ইসলামী দল উম্মাহ পার্টি নির্বাচনে জয়লাভ করে সাদেক আল মাহদীর নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়। ১৯৮৯ সালে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ওমর হাসান আল বশীর আরেক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে নির্বাচিত সরকারের পতন ঘটান। তিনি পার্লামেন্ট বাতিল করেন এবং ১৩ সদস্যের বিপ্লবী সামরিক কাউন্সিল গঠন করেন। উম্মাহ পার্টির নেতা সাদেক আল মাহদী ও ন্যাশনাল ইসলামিক ফ্রন্ট নেতা হাসান আল তুরাবীসহ বহু রাজনৈতিক নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। দেশের ৪০টি প্রকাশিত পত্রিকার ৩৬টিকে নিষিদ্ধ করা হয়। সামরিক জাস্তা ওমর হাসান আল বশীর কয়েক মাসের মধ্যেই বুঝতে পারেন যে, তাঁকে ক্ষমতায় টিকে থাকতে হলে ইসলামিক গ্রুপের সহায়তা নিতে হবে। এক পর্যায়ে তিনি ন্যাশনাল ইসলামিক ফ্রন্ট নেতা হাসান আল তুরাবীর সাথে সমঝোতায় উপনীত হন এবং তুরাবীর নেতৃত্বে ৪০ সদস্যের এক পরিষদ গঠন করেন। ১৯৯৬ সালে ন্যাশনাল ইসলামিক ফ্রন্টের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ন্যাশনাল কংগ্রেস পার্টি। কিন্তু জেনারেল বশীরের সাথে তুরাবীর সুসম্পর্ক বেশিদিন টিকেনি। ১৯৯৯ সালে তাদের বিরোধ তুঙ্গে পৌঁছে। তুরাবী পদত্যাগ করেন। জেনারেল বশীর পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেন, সংবিধান স্থগিত করেন এবং দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন।

জরুরি অবস্থার মধ্যেই ২০০০ সালে প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২০০১ সালে পার্লামেন্ট পুনরুজ্জীবিত হলেও জরুরি অবস্থা বহাল থাকে। ১৯৯৮ সালে সুদানের দক্ষিণাঞ্চলের বিদ্রোহীরা সুদানীজ পিপলস লিবারেশন আর্মি গঠন করে। বিদ্রোহীদের সাথে একটা সমঝোতায় উপনীত হতে হাসান আল তুরাবী একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন। জেনারেল বশীর এতে ক্ষুব্ধ হয়ে তুরাবীকে গ্রেফতার করেন। ২০০৫ সালে প্রেসিডেন্ট বশীর দক্ষিণাঞ্চলের বিদ্রোহীদের নিয়ে একটি কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন। পাশাপাশি সরকার বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করে। এ নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে সমালোচনার ঝড় উঠে। ২০০৯ সালে আন্তর্জাতিক আদালত প্রেসিডেন্ট বশীরের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লংঘনের জন্য গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করে।

মুসলিম দেশগুলোর রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

তুরস্ক, মিশর, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে কিছু অভিন্ন বৈশিষ্ট্য বেরিয়ে আসে। বিশেষ করে নির্বাচনে ভোটারদের আচরণে একটি অভিন্ন প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমত, তুরস্ক ব্যতীত অন্যান্য দেশগুলোর এক সময় ইউরোপীয় উপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অধীনে দীর্ঘকাল যাবৎ শাসিত হওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। উপনিবেশিক শক্তি শুধু শাসন করেই ক্ষান্ত হয়নি; তারা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও সুদূরপ্রসারী প্রভাব রেখে গেছে যার নেতিবাচক প্রভাব আজও তাদেরকে বহন করতে হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, প্রায় প্রতিটি দেশই উপনিবেশিক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম করে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তরকালে স্বাধীনতা অর্জন করে। এরূপ আন্দোলন সংগ্রামের প্রধান চালিকাশক্তি ছিল মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনা। কোনো কোনো দেশের আন্দোলনে আলেম সমাজ বেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

তৃতীয়ত, সকল দেশই ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে গ্রহণ করে স্বাধীন দেশের কার্যক্রম শুরু করে। কিন্তু পরে কোনো দেশেই তা তেমন টেকসই হয়নি। স্বৈরতান্ত্রিক ও সামরিক শাসনের যাঁতাকলে প্রায় প্রতিটি দেশকেই নিষ্পেষিত হতে হয়েছে। একমাত্র মালয়েশিয়া বহু বাধা-বিপত্তির মধ্যেও পার্লামেন্টারি পদ্ধতিকে নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে নিতে পেরেছে। অন্যান্য দেশে চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্যে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা তেমন একটা আসেনি। অবশ্য সাম্প্রতিককালে তুরস্ক ও ইন্দোনেশিয়ায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি কিছুটা স্থিতিশীলতা পাচ্ছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

চতুর্থত, একমাত্র মালয়েশিয়া ব্যতীত অন্যান্য দেশের রাজনীতিতে সামরিক বাহিনী প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করেছে এবং তা এখনো চলছে। সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল, সংধান বাতিল বা স্থগিতকরণ, জরুরি অবস্থা জারীকরণ, নানা ছলছুতায় দীর্ঘকাল ক্ষমতায় আঁকড়ে থাকা ইত্যাদির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ব্যাহত করা মুসলিম দেশগুলোর সাধারণ রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য পরিণত হয়েছে।

পঞ্চমত, সকল দেশই পার্লামেন্টারি পদ্ধতির আওতায় বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে যাত্রা শুরু করে। মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনা সম্বলিত দলগুলোর নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত হলেও পরবর্তীতে উদার গণতান্ত্রিক, সমাজতন্ত্রী-কম্যুনিষ্ট, ইসলামপন্থী সকল মতাদর্শের রাজনৈতিক দলের বিকাশ ঘটে। এর মধ্যে ইসলামপন্থী ও কম্যুনিষ্টরা আবার অপেক্ষাকৃত অধিকতর নিপীড়নের শিকার হয়।

ষষ্ঠত, প্রায় প্রতিটি দেশই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আর্থিক ও সামরিক সহায়তা পেয়ে আসছে। একমাত্র ইরান যুক্তরাষ্ট্রের চোখ রাঙানিকে ভয় না করে এখনও

মাথা উঁচু করে চলেছে। সৌদি আরব ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক মর্যাদাপূর্ণ নয়। মিশর, তুরস্ক, পাকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়ার সামরিক বাহিনীর উপর মার্কিন প্রভাব সকলের কাছে দৃশ্যমান। যুক্তরাষ্ট্রের চাপে মিশর ও তুরস্ক ইসরাইলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্রের ‘ওয়ার এগেইনস্ট টেরর’ নীতির অন্যতম সহযোগী হিসেবে গণ্য করা হয়। মালয়েশিয়ার রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর প্রভাব বিশেষভাবে দৃশ্যমান না হলেও সম্প্রতি তারাও ইন্দোনেশিয়ার সামরিক বাহিনীর সাথে ‘ওয়ার এগেইনস্ট টেরর’ কর্মসূচিতে সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। মালয়েশিয়ার নেতা মাহাথির মোহাম্মদ পাশ্চাত্যকে তেমন পাত্তা দিতেন না। বরং কখনো কখনো কঠোর সমালোচনাও করতেন। সুদানের প্রেসিডেন্ট বশীর ইতোমধ্যে পাশ্চাত্যের বিরাগভাজন হয়ে পড়েছেন। এর আগে লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফী এবং সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আসাদ ও পরবর্তীতে তাঁর ছেলে প্রেসিডেন্ট বাশারও পাশ্চাত্যের কাছে অপরিভাজন বলে চিহ্নিত হয়েছেন। তুরস্কের এরদোগান সরকার পাশ্চাত্যের সাথে কৌশলগত আপস করে চলেছে। সব ক’টি দেশই ইউএসএআইডি, আইএমএফ ও বিশ্ব ব্যাংক থেকে উন্নয়ন কার্যক্রম ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় অর্থায়ন সহায়তা নিয়ে থাকে।

সম্ভবত, প্রায় প্রতিটি দেশেই জাতীয়তাবাদ ও সেকুলারিজম বেশ শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। তুরস্কে সাংবিধানিকভাবেই ধর্ম ও রাষ্ট্রকে আলাদা রাখা হয়েছে। মিশর ও তুরস্কে ধর্মের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গঠন করা যায় না। তুরস্ক ব্যতীত সকল দেশেই ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে সংবিধানে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। প্রায় সকল দেশেই শক্তিশালী ইসলামী রাজনৈতিক দল রয়েছে। আবার সকল দেশেই আইনের উৎস হিসেবে শরীয়াহকে কমবেশি স্বীকৃতি দেয়া হয়।

অষ্টমত, প্রায় প্রতিটি দেশেই আঞ্চলিক, নৃতাত্ত্বিক বা ধর্মীয় কারণে গোষ্ঠীগত সংঘাতের অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং এ জন্য তাদেরকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে বা হচ্ছে। তুরস্কের কুর্দী বিদ্রোহী, সুদানের দারফুর বিদ্রোহী, ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তিমুর ও আচেহ প্রদেশের সংঘাত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জাতিগত সংঘাত (১৯৭১), মালয়েশিয়ায় চীনা ও ভারতীয়দের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ইত্যাদি এসব দেশের রাজনীতিতে মতপার্থক্য ও স্বার্থগত দ্বন্দ্বকে মাঝে মাঝে জটিল করে তুলে এবং বিদেশী শক্তি তা থেকে সুবিধা নেয়।

নবমত, প্রতিটি দেশেই শক্তিশালী ইসলামী আন্দোলন বা রাজনৈতিক দল রয়েছে। তারা ক্রমান্বয়ে অধিকতর জনভিত্তি গড়ে তুলছে এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে রাজনৈতিক দক্ষতা অর্জন করছে। তাদের এই শক্তি বৃদ্ধি আবার তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কোনো কোনো দেশে তারা সরকারী নিগ্রহের শিকার হচ্ছে। মিশরের ব্রাদারহুড, সুদানের হাসান আল তুরাবীর ন্যাশনাল কংগ্রেস পার্টি এবং তুরস্কে আরবাকানের পার্টিকে সামরিক সরকারের কোপানলে পড়ে বার বার নাম পাল্টাতে হয়েছে। সুদান ও

পাকিস্তানের ইসলামী দল সামরিক সরকারের সাথে ক্ষমতার অংশীদার হলেও তার ফল ভালো হয়নি।

দশমত, আলোচ্য দেশগুলোর পার্লামেন্ট নির্বাচন পদ্ধতি স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ বলে গন্য করার সুযোগ কম থাকলেও স্পষ্টতই লক্ষ্যনীয় যে, পূর্ণাংগ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নীতির প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ দলগুলো নির্বাচনে ভোটারদের মধ্যে বিশেষ একটা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারছে না। এ পর্যন্ত কোনো দেশেই ইসলামী নামধারী দলগুলো গড়ে ২০ ভাগের বেশি ভোট পায়নি। কোনো এক নির্বাচনে মোটামুটি ভাল ফল করলেও তা আর টেকসই হয়নি। অধিকাংশ দেশেই পূর্ণাংগ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নীতির প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ ভোটার সংখ্যা মাত্র ৫-৭ ভাগের মত। সেক্যুলার বা জাতীয়তাবাদী দলগুলোর প্রতি ভোটারদের আকর্ষণ বেশি বলে প্রতীয়মান হয়। পাশাপাশি প্রায় সব দেশেই সমাজতন্ত্রী বা কম্যুনিষ্ট মতাদর্শের দলগুলোর ভোট প্রাপ্তির হার বেশ হতাশাব্যঞ্জক।

একাদশত, ট্রাডিশনাল বা প্রচলিত পুরানো ধাঁচের ইসলামী দলগুলোর চাইতে যে সব ইসলামী দল সমাজকল্যাণমূলক কাজ এবং সুশাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কথা বেশি বলছে ভোটাররা তাদের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হচ্ছে। তুরস্কের এ কে পার্টি ও মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুড এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মালয়েশিয়ায় আনোয়ার ইব্রাহিমের নবগঠিত জাস্টিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টির কথাও বলা যেতে পারে। তবে পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামী দীর্ঘকাল অপেক্ষাকৃত অনুকূল পরিবেশে কাজ করেও কেন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারছে না তা এক গবেষণার বিষয়। একইভাবে বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামীই বা কেন তেমন জনপ্রিয়তা পাচ্ছে না তাও পর্যালোচনার দাবি রাখে।

দ্বাদশত, মুসলিম দেশগুলো বহু সমস্যা মোকাবিলা করে পার্লামেন্ট নির্বাচন পদ্ধতি স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষতার সাথে এগিয়ে নিতে চাইলেও পাশ্চাত্যের ষড়যন্ত্র ও দেশীয় কুচক্রীদের কারণে তা টেকসই হতে পারছে না। বিভিন্ন সময়ে মিশর, তুরস্ক, আলজেরিয়া, প্যালেস্টাইন, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও সাম্প্রতিককালে ইরানে বিদেশী ষড়যন্ত্র নির্বাচন প্রক্রিয়াকে নানাভাবে হুমকির মুখে ফেলেছে।

বাংলাদেশের ইসলামী দলগুলোর ভবিষ্যৎ

বাংলাদেশে গত তিন-চার দশকের ইসলামী রাজনীতি প্রত্যাশিত সুফল বয়ে আনতে পারেনি। সেক্যুলার আওয়ামী লীগ, জাতীয়তাবাদী বিএনপি ও সুবিধাবাদী জাতীয় পার্টি ঘুরে ফিরে বিভিন্ন মেয়াদে ক্ষমতায় ছিল। কিন্তু এ তিনটি দলের বৈশিষ্ট্য কম-বেশি একই। মূলত ক্ষমতার মোহ, বস্তুগত স্বার্থলিপ্সা, অসততা ও অদক্ষতা, প্রতিহিংসা পরায়ণতা ইত্যাদি কারণে জাতি খুব বেশি আগাতে পারেনি। ইসলামী দলগুলোর মধ্যে জামায়াতে ইসলামী ছাড়া অন্যান্য দলগুলোর সাংগঠনিক ও জনভিত্তি উল্লেখ করার মতো নয়।

বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে জামায়াতে ইসলামীর কোনো বিকল্প আপাতত দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু সবচেয়ে পুরানো রাজনৈতিক দল হওয়া সত্ত্বেও জামায়াত নির্বাচনী দৌড়ে বেশ পেছনে পড়ে আছে। বাস্তবতা এমন দাঁড়িয়েছে যে, সততার সুনাম থাকা সত্ত্বেও বর্তমান নেতৃত্ব নিয়ে জামায়াতের পক্ষে ভবিষ্যতে এককভাবে সরকার গঠনের মত জনপ্রিয়তা অর্জন করা আদৌ সম্ভব নয় বলে কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করেন। জামায়াতে ইসলামীর সীমাবদ্ধতা নিয়ে নিম্নের বিষয়গুলো পর্যালোচনা করা যেতে পারে:

(এক) ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করায় জামায়াতের প্রথম সারির বর্তমান নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিরূপ প্রচারণা থাকায় সর্বজন গ্রহণযোগ্য জাতীয়ভিত্তিক ইমেজ বিন্দিং তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে। বাস্তবতা হচ্ছে, যে কোনো দেশে বিভিন্ন বিষয়ে রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। ১৯৭১ সালে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল এবং বলাই বাহুল্য ১৯৭০ সালের নির্বাচনেও দেশের জনগণ আওয়ামী লীগের পক্ষে বিরাট সমর্থন দিয়েছিল। গণতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী আওয়ামী লীগেরই সরকার গঠনের অধিকার ছিল। কিন্তু পাকিস্তানী সামরিক জাঙ্গা সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধা সৃষ্টি করে এবং অধিকন্তু পাশবিক ও নির্মমভাবে হত্যাজ্ঞা চালায়। কোনো বিবেকবান মানুষ তা সমর্থন করতে পারে না। জামায়াত ভারতের আধিপত্যবাদী আচরণের আশংকা থেকে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করার বিষয়টি রাজনৈতিক মতপার্থক্য হিসেবে গন্য করা গেলেও পাকিস্তানী সামরিক জাঙ্গার পক্ষে যে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল তা দেশের জনগণ কর্তৃক গ্রহণযোগ্য হয়নি। পাকিস্তানী সামরিক জাঙ্গার পরাজয়ের সাথে সাথে জামায়াতের রাজনৈতিক কৌশলেরও পরাজয় ঘটেছে। কোনো পরাজিত শক্তির পক্ষে স্বাধীন বাংলাদেশের সরকারের নেতৃত্ব দেয়ার নৈতিক অধিকার থাকে না। প্রায় চার দশকের ব্যবধানে বিষয়টি জাতি ভুলতে বসেছিল; কিন্তু সেক্যুলার রাজনৈতিক দল, মিডিয়া ও সিভিল সোসাইটি বিষয়টিকে প্রচার-প্রপাগান্ডার মাধ্যমে আবার জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। এর কারণ হলো: আওয়ামী লীগের পরিবর্তে বিএনপির সাথে জামায়াতের রাজনৈতিক জোট গঠন করা। বিষয়টি সাধারণ জনগণের মধ্যে কতটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে তা পরিমাপ করা না গেলেও নতুন প্রজন্মের মধ্যে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে তা বলা যেতে পারে। এর পেছনে প্রতিবেশী দেশ ও আন্তর্জাতিক স্বার্থান্বেষী মহলের মদদ রয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টি সামনে চলে আসায় এটি আরো জটিল আকার ধারণ করতে পারে। কেউ কেউ মনে করেন, আশা করা যায় জামায়াত নেতৃত্বকে দোষী সাব্যস্ত করা সহজ/সম্ভব হবে না, তাই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টি তাড়াতাড়ি হয়ে গেলে বিষয়টি একবারে চিরদিনের জন্য সুরাহা হয়ে যাবে। কিন্তু ভিন্নমতও রয়েছে। তাদের ধারণা সরকার ইস্যুটিকে সহজে শেষ করবে না। বরং নানা

অজুহাতে এটাকে জিইয়ে রাখতে চাইবে। কারণ সরকার আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে নিজ স্বার্থেই বিষয়টিকে ঝুলিয়ে রাখবে। পাশাপাশি নেতিবাচক প্রচার-প্রপাগান্ডা আরো বৃদ্ধি পেতে পারে। এমতাবস্থায়, জামায়াতের রাজনৈতিক ইমেজ পুনরুদ্ধার বা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত কঠিন হবে।

(দুই) শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃত্বের দুর্বলতা

দলটির শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃত্বে কেউ কেউ বৃদ্ধ ও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবং নতুন উদ্যমে দলকে এগিয়ে নেয়ার মতো সামর্থ্য তাদের নেই।

(তিন) সংগঠনে রেজিমেণ্টেড এনভায়রনমেন্ট

জামায়াতের বন্ধদুয়ার পরিবেশ (রেজিমেণ্টেড এনভায়রনমেন্ট) থাকায় ইসলামী মূল্যবোধ সম্পন্ন উদারনৈতিক ব্যক্তিত্বেরা ঐ দলে প্রবেশ করতে পারে না। দলটিতে সংস্কৃতির অভাব না হলেও দেশ পরিচালনায় নেতৃত্ব দেয়ার মতো উপযুক্ত ও দক্ষ লোকের অভাব রয়েছে। জামায়াতের বাইরে যেসব সংস্কৃতি ও দক্ষ লোক রয়েছে তারা যে কোনো পর্যায়ে জামায়াতে যোগ দিতে উৎসাহবোধ করে না। এর প্রধান কারণ- প্রথমত, জামায়াতের বন্ধদুয়ার পরিবেশ; দ্বিতীয়ত, জামায়াতের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা।

(চার) নেতিবাচক প্রচার-প্রপাগান্ডা

বেশ কিছুদিন ধরে বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম ও কতিপয় বুদ্ধিজীবী জামায়াতকে মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক, স্বাধীনতাবিরোধী ইত্যাদি অভিধায় আখ্যায়িত করে দলটিকে মোটামুটি বিতর্কিত করে তুলতে সক্ষম হয়েছে। জামায়াত নেতাকর্মীরা এটা সরাসরি কতটা উপলব্ধি করে, তারচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ভোটারদের মধ্যে এর বেশ প্রভাব পড়েছে।

(পাঁচ) রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আধুনিক ধ্যান-ধারণার অভাব

বিশ্বায়নের পরিবর্তনের ধারায় রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আধুনিক ধ্যান-ধারণা নিয়ে জনগণের কাছে যাওয়ার ক্ষেত্রে জামায়াত নেতাদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আইন প্রণয়ন, উন্নয়ন কৌশল, অর্থনীতি ও পররাষ্ট্র নীতির মত মৌলিক বিষয়ে জামায়াতের বক্তব্য জনগণের কাছে যেমন স্পষ্ট নয়; তেমনি আকর্ষণীয়ও নয়। সমস্যা সংকুল বাংলাদেশের বেশ কিছু মৌলিক সমস্যা রয়েছে। সব দলই এসব বিষয়ে কোনো না কোনো বক্তব্য দিয়ে থাকে। এসব সমস্যার অগ্রাধিকার নির্ণয় করে জামায়াত উত্তম বিকল্প কোনো সমাধানের দিকনির্দেশনা জাতির সামনে পেশ করতে পারেনি। আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির অসং নেতৃত্বের বিকল্প হিসেবে জামায়াত নেতারা তাদের দলকে জাতির সামনে তুলে ধরতে পারেননি।

(ছয়) ভোটার রাজনীতিতে কৌশলের অভাব

বাংলাদেশে ভোটার রাজনীতিতে কিছু কৌশলের আশ্রয় না নিলে নির্বাচনে জয়লাভ করা যায় না। এক্ষেত্রে জামায়াতের বেশ সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রথমত, জামায়াত ভোটারদের

চাহিদার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে কথা বলার পরিবর্তে ইসলামী আদর্শের প্রতি ভোটারদের বেশি আহ্বান করে যা পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের নির্বাচনী সংস্কৃতির সাথে খাপ খায় না। দ্বিতীয়ত, ভোটের রাজনীতিতে বিপুল অর্থ ব্যয়, অপব্যয় ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছলচাতুরীর আশ্রয় নিতে হয়। এসব প্রবণতা যেমন ইসলামী আদর্শের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়, তেমনি সেগুলো না করলে নির্বাচনী সাফল্য লাভ করাও কঠিন।

(সাত) নতুন প্রজন্মের চিন্তা-চেতনার আলাকে নিজেদের উপস্থাপনে ব্যর্থতা নতুন প্রজন্মের ভোটারদের চিন্তা-চেতনা ও আশা-আকাংখা বর্তমান মিডিয়া প্রচারণার দ্বারা বহুলভাবে প্রভাবিত। গতানুগতিক ধারায় ইসলামী আদর্শের প্রতি আহ্বান জানানোর কৌশল কার্যকর হচ্ছে না। এ জন্য প্রয়োজন আধুনিক পরিভাষার ব্যবহার ও উপস্থাপনার নতুন আংগিক। বিষয়টি অনুধাবনে জামায়াত নেতারা খুব একটা সফল হননি।

(আট) ভূমন্ডলীয় রাজনীতি ও বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে প্রয়োজন নতুন কৌশল আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বন্ধুহীন হয়ে কোনঠাসা ও একলা চলো নীতি গ্রহণ করে টেকসই রাজনীতি করা বাস্তবসম্মত নয়। নীতি ও আদর্শের সাথে আপস না করেও কৌশলগত কারণে উদারনীতি অনুসরণ করে সমর্থনের পরিধি বৃদ্ধির দৃষ্টিভঙ্গি জামায়াতের নেই।

(নয়) জোটের শরীক বিএনপির ভবিষ্যৎ

ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী ও ভারতীয় আধিপত্যবাদ বিরোধী বিএনপি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণের পক্ষে একটি সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও বেগম খালেদা জিয়ার জনপ্রিয়তা ও ইমেজ বিএনপির সবচেয়ে বড় সম্পদ। সম্ভাব্য ভারতীয় আধিপত্যবাদী আগ্রাসন মোকাবিলায় জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তির ঐক্য একান্ত অপরিহার্য। বিগত কেয়ারটেকার সরকার সারা দেশে বিএনপি নেতৃত্বের উপর যে দুর্নীতির কলংক লাগিয়ে দিয়েছে, বিশেষ করে বেগম জিয়ার দুই ছেলের উপর যে অপবাদ আরোপিত হয়েছে, তা দলটির বিশেষ ক্ষতি করেছে। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারও তাদের পিছু ছাড়বে না। দলটির সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী স্ট্যান্ডিং কমিটির অধিকাংশ নেতাই বর্তমানে বয়সের ভারে নুজ এবং অনেকটা অকার্যকর। মধ্যবয়সী সাহসী নেতাদের অনেকেই মামলা-মোকদ্দমায় দিশেহারা। ছাত্রনেতা-তরুণদের মধ্যে হতাশা বিরাজ করছে। বেগম জিয়া শারীরিকভাবে দিনে দিনে দুর্বল হয়ে যাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে। দলের মধ্যে তারেক রহমানের বিরূপ জনপ্রিয়তা থাকলেও তিনি আগামী ৫ বছরে দেশে ফিরতে পারবেন কিনা তা নিশ্চিত নয়। দলের ভেতর অভ্যন্তরীণ কোন্দল এত বেশি যে, নতুন কমিটি গঠন নিয়ে কলহ আরো বাড়তে পারে। সর্বোপরি দলটির নেতাকর্মীদের মধ্যে স্বার্থের লড়াই যত তীব্র, রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি অঙ্গীকার তেমন নেই। ফলে ভবিষ্যতে

দেশের সংকটকালে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণের পক্ষে দলটি কতটা ভূমিকা রাখবে তা জোর দিয়ে বলা যায় না। এমতাবস্থায় বিএনপি ক্ষয়িষ্ণু হবার ঝুঁকিতে পড়তে পারে। এরূপ ঘটলে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তির ঐক্য ভবিষ্যতে কতটা কার্যকর হবে তা বলা কঠিন।

বিকল্প রাজনীতির সন্ধান

দীর্ঘ প্রায় ৫০ বছর জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের মাটিতে কাজ করে ব্যাপক সাংগঠনিক মজবুত ভিত্তি অর্জন করলেও ভোটারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সমর্থন তৈরী করতে পারেনি। এর বহুবিধ কারণ নির্ণয় করা যেতে পারে। কিন্তু এরূপ ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতার প্রতিক্রিয়া কর্মীবাহিনীর মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। অপরদিকে বিএনপির মত জাতীয়তাবাদী শক্তি দুর্নীতি ও কৌশলগত ব্যর্থতার জন্য জিয়াউর রহমানের ইমেজকে কাজে লাগাতে পারেনি। এজন্য দেশের একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সচেতন, দেশপ্রেমিক, সৎ ও নিষ্ঠাবান ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী নাগরিক রয়েছেন যারা বিএনপির কর্মকাণ্ডে হতাশ। তারা বিএনপি ও জামায়াতের ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতার জন্য বিকল্প রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান খুঁজে পাচ্ছে না। এ জনগোষ্ঠী/ভোটার মূলত আওয়ামী লীগ বিরোধী। এমতাবস্থায় তাদের সামনে নিম্নের বিকল্পগুলো রয়েছে:

প্রথমত: জামায়াতের কর্মকৌশলে ব্যাপক সংস্কার আনা।

দ্বিতীয়ত: বিএনপির অপেক্ষাকৃত বয়স্ক, পুরানো ও দুর্নীতিবাজ বলে পরিচিত নেতৃত্বকে পরিবর্তন করা ও ব্যাপক সংস্কার আনা।

সন্দেহ নেই বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। দলটির স্বার্থান্বেষী চক্র কোনো ভালো সংস্কার হতে দেবে না। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, দেশপ্রেমিক, সৎ ও নিষ্ঠাবান ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী নাগরিকরা বিএনপির কাছে এটাই প্রত্যাশা করে। বিএনপি নেতৃত্ব এ বাস্তবতা বুঝতে ব্যর্থ হলে তাদেরকে ভবিষ্যতে তার খেসারত দিতে হবে।

তৃতীয়ত: দেশপ্রেমিক, সৎ ও নিষ্ঠাবান ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী নাগরিকরা এবং জামায়াতের সম্ভাবনাময় জনশক্তির একটি অংশ বিএনপিতে যোগ দিতে পারে এবং দলটিকে একটি আদর্শবাদী দলে পরিণত করার চেষ্টা করতে পারেন। তবে এ বিকল্পটি তেমন বাস্তবসম্মত মনে হয় না। কারণ বিএনপির বর্তমান নেতৃত্ব নতুনদের দলে নেতৃত্বের আসন দিতে চাইবে না।

চতুর্থত: জাতির বৃহত্তর স্বার্থে তথা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রয়োজনে বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যকার জোটের সম্পর্ক আরো

জোরদার করা। একটা সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নিয়ে জোট নেতৃবৃন্দ উভয় দলের মধ্যে ব্যাপক সংস্কার করে এগিয়ে যেতে পারেন। এ বিষয়ে উভয় দলের শুভাকাংখী সিভিল সোসাইটি উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন।

পঞ্চমত: স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ, জনকল্যাণ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় নিয়ে একটি উদারনৈতিক নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করা যেতে পারে।

- প্রস্তাবিত দল ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী বলে ঘোষণা দেবে; তবে ‘ইসলামী রাষ্ট্র’ বা ‘শরীয়াহ আইন’ চালু করার মত হার্ডলাইন অনুসরণ করবে না।
- প্রস্তাবিত দল কোনো রেজিমেণ্টেড বা ক্যাডারভিত্তিক দল হবে না। দলের নামকরণের ব্যাপারেও কোনো ইসলামী শব্দ বা পরিভাষা ব্যবহার করা ঠিক হবে না। এ ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বের তুরস্কসহ বিভিন্ন দেশগুলোর অভিজ্ঞতাকে সামনে রাখা যেতে পারে।
- প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুসরণ করে তৃণমূল থেকে নতুন নেতৃত্ব বাছাই করতে হবে যাতে সঠিক নেতৃত্ব বাছাই করা যায়। পাশ্চাত্যের ধাচে অত্যন্ত সুশৃংখল একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এভাবে গড়ে তোলা যেতে পারে।
- দলটিতে জামায়াতের জনমুখী নেতৃত্বদানের যোগ্য বেশকিছু নেতাকর্মী যোগ দিতে পারে। অপরদিকে বিএনপির সৎ ও নিষ্ঠাবান ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী নেতাকর্মীরা যোগ দেবে বলে আশা করা যায়। এক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত তরুণ নেতৃত্বকে গুরুত্ব দিতে হবে।

নতুন রাজনৈতিক কৌশলের যৌক্তিকতা

কোনো দেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় দলের নাম পরিবর্তন নতুন কিছু নয়। মূল লক্ষ্য ঠিক রেখে কৌশল পরিবর্তন কোনো কোনো সময় অপরিহার্য বলে বিবেচিত হতে পারে। বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক দলের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, শাসক গোষ্ঠীর নিপীড়নের মুখে তারা নাম পরিবর্তন করে ভিন্ন অবয়বে নতুন দল আত্মপ্রকাশ করেছে। বিভিন্ন দেশে বামপন্থী দলগুলো নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে তারা নতুন নামে নতুন নেতৃত্বে বা অন্য দলে অনুপ্রবেশ করে তাদের কাজ চালিয়ে গেছে। একইভাবে ইসলামী দলগুলো তাদের কৌশল পরিবর্তন করেছে। উদাহরণ হিসেবে তুরস্কের কথা বলা যায়। তুরস্কের ইসলামী নেতা নাজমুদ্দিন আরবাকান প্রথমে ক্ষমতাসীন জাস্টিস পার্টিতে যোগ দেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সুলেমান ডেমিরেলের সাথে মতপার্থক্য হওয়ায় ১৯৭০ সালে মিল্লি নিজাম পার্টি গঠন করেন। ১৯৭০ সালে সামরিক আইন জারী হলে সকল পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। এক বছর পরে ১৯৭১ সালে আরবাকান মিল্লি সালামত পার্টি নামে নতুন পার্টি গঠন করেন। ১৯৭৩ সালে দলটি

নির্বাচনে প্রায় ১২ শতাংশ ভোট পেয়ে তৃতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বামপন্থী রিপাবলিকান পার্টির সমর্থনে তিনি সরকার গঠন করেন। ১৯৮০ সালে তুরস্কে পুনরায় সামরিক আইন জারী হলে আবার সকল পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। ১৯৮৩ সালে আরবাকান রাফাহ পার্টি (ওয়েলফেয়ার পার্টি) নামে আরেকটি নতুন পার্টি গঠন করেন। এ নতুন দলটি ‘জাস্ট অর্ডার’ শ্লোগান দেয়ে ভোটারদের আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়। ১৯৯৬ সালে দলটি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও তানসু সিলারের ট্রু পাথ পার্টির সমর্থনে সরকার গঠন করে। ১৯৯৮ সালে সাংবিধানিক আদালত সেক্যুলার নীতি ভংগের দায়ে রাফাহ পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। আরবাকান ও রাফাহ পার্টির অনুসারীরা ভার্সু পার্টি নামে বিকল্প পার্টি গঠন করে। দলটি রাফাহ পার্টির নতুন সংস্করণ— এ অজুহাতে ভার্সু পার্টিকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ইতোমধ্যে নীতি ও কৌশলের প্রশ্নে দলের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। সংস্কারপন্থী বলে পরিচিতরা আলাদা হয়ে জাস্টিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি (একে পার্টি) এবং আরবাকানপন্থীরা ফেলিসিটি পার্টি (সাদাত পার্টি) গঠন করেন। পুরাতন রাফাহ পার্টির ১০১ জন পার্লামেন্ট সদস্য দুই দলে বিভক্ত হয়ে যান। ২০০২ সালের নভেম্বরে একে পার্টি বিপুল ভোট পেয়ে সরকার গঠন করে।

অপরদিকে, ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) ইতিহাস বলছে, দলটি দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছেছে। ১৯২৫ সালে উগ্র সাম্প্রদায়িক সংগঠন রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ (আরএসএস) গঠিত হয়। দলটি মহাত্মা গান্ধীকে মুসলিমপ্রীতির জন্য কঠোর সমালোচনা করতো। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হলেও সব সরকারই দলটিকে উগ্র সাম্প্রদায়িক বলে বিবেচনা করতো। মহাত্মা গান্ধী আততায়ীর হাতে নিহত হলে আরএসএসকে দায়ী করা হয় এবং এর ১৭০০০ কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। এ সময়ে তারা কৌশল পাল্টে ১৯৫১ সালে ড. শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীর নেতৃত্বে ভারতীয় জনসংঘ (বিজেএস) গঠন করে। নতুন নামে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তারা ভারতের চতুর্থ বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৬৭ সালে নির্বাচনে তারা আরো ভাল ফল পায়। তারা বহু রাজ্যে কম্যুনিষ্টদের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। ১৯৭১ সালে বাজপেয়ীর নেতৃত্বে দলটি ‘দারিদ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ’ শ্লোগান দিয়ে নির্বাচনে অংশ নেয়। ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা জারী করলে আরএসএস-এর বহু কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৭৭ সালে নির্বাচনে চরণ সিংহের নেতৃত্বে জনতা পার্টি, জনসংঘ ও অপর কয়েটি পার্টি নিয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। জনসংঘ নেতা বাজপেয়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও এলকে আদভানী তথ্যমন্ত্রী হন। কিন্তু কোয়ালিশন সরকার সফল হতে পারেনি। ১৯৮০ সাল জনসংঘ আলাদা নামে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) গঠন করে।

নতুন দল গঠনের চ্যালেঞ্জ

Strength

- অপেক্ষাকৃত তরুণ ও নতুন নেতৃত্ব প্রস্তাবিত দলকে এগিয়ে নেবেন।
- যুদ্ধাপরাধের অপবাদ আছে বা অভিযুক্ত হয়েছেন এমন কাউকে নেতৃত্বে বা দলে নেয়া হবে না।
- দুর্নীতির অপবাদ আছে বা অভিযুক্ত হয়েছেন বা নৈতিক সুনামের অভাব রয়েছে এমন ব্যক্তিদের নেতৃত্বে বা দলে নেয়া হবে না।
- প্রস্তাবিত দল কোনো রেজিমেণ্টেড বা ক্যাডারভিত্তিক দল হবে না। উন্মুক্ত ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দলে রিক্রুটমেন্ট ও নেতৃত্ব বাছাই করা হবে।
- বাংলাদেশকে একটি সত্যিকার কল্যাণরাষ্ট্রে পরিণত করার প্রত্যয় নিয়ে নতুন ধ্যানধারণা সহকারে নতুন দল একটি উঁচুমানের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি চালু করবে।
- প্রস্তাবিত দল একটি উন্নত থিংক ট্যাংক প্রতিষ্ঠা করবে। এ সংস্থা গবেষণা, সমীক্ষা ও রিভিউ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যুতে নীতি-নির্ধারণ করবে।
- সার্চ পদ্ধতিতে সারাদেশ থেকে মেধাবী, সৎ ও দক্ষ নেতৃত্ব বাছাই করা হবে।

Weakness

- প্রস্তাবিত দল গঠনে প্রধান সমস্যা হবে শীর্ষ নেতৃত্ব নির্ধারণ করা; কারণ বাংলাদেশে ব্যক্তি ও পরিবারকেন্দ্রিক নেতৃত্বের বাইরে অন্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত কঠিন।
- পর্যাপ্ত তহবিল ছাড়া নতুন দল গঠনের কাজ এগিয়ে নেয়া কঠিন হবে।
- রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব বাছাইয়ে সরকার পরিচালনার উপযুক্ত যোগ্য নেতৃত্ব খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে।
- সকল স্তরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব পাওয়া কঠিন হবে।

Opportunities

- দেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি চালু থাকায় নতুন দল গঠনে কোনো প্রকার আইনগত সমস্যা হবে না। আইন অনুসরণ করেই দল গঠনের কাজ এগিয়ে নিতে হবে।
- নতুন দলের নাম কোনো ধর্মীয় পরিভাষা অনুসারে হবে না। ফলে প্রচারমাধ্যমে অযথা অপপ্রচার হবে না বলে আশা করা যায়।

- নতুন দলে ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী ও দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী লোক পাওয়া কঠিন হবে না। কারণ জামায়াত ও বিএনপিতে সক্রিয় নয়— এরূপ ভালো লোক পাওয়া কঠিন হবে না।
- আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াত ও জাতীয় পার্টির বাইরে এসে নতুন ধ্যান-ধারণা নিয়ে নতুন দল গঠন রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন চমক সৃষ্টি করতে পারে।

Threats

- নতুন দল গঠনের উদ্যোগকে সরকার ভালো চোখে নাও দেখতে পারে। সেক্ষেত্রে সমস্যা মোকাবিলা করতে হতে পারে। তবে এরূপ উদ্যোগকে সরকার বিএনপি বা জামায়াতের ভাঙ্গন বলে মনে করলে সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে বলে প্রতীয়মান হয় না।
- প্রধানত বিএনপি-জামায়াত থেকেই নতুন দলে লোক আসবে, সে ক্ষেত্রে ঐ দুটো দল নতুন দল সম্পর্কে অপপ্রচার চালাতে পারে।
- ছাত্রশিবিরের প্রাক্তন নেতাকর্মীরা ব্যাপক হারে নতুন দলে যোগ দিতে থাকলে জামায়াতের সাথে বিরাট ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হতে পারে।

সুপারিশ:

১. প্রস্তাবিত নতুন রাজনৈতিক দলটি জামায়াতের কোনো বিকল্প দল হবে না এবং এটি কেবল নির্বাচনী রাজনীতির জন্য একটি বিকল্প প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে— এ শর্তে জামায়াত নীতিগত সমর্থন দিতে পারে।
২. প্রস্তাবিত নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন তৈরী করা যেতে পারে।
৩. প্রস্তাবিত নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য কলাকৌশল নির্ধারণ ও অভ্যন্তরীণ প্রস্তুতি এখনই শুরু করা যেতে পারে।
৪. প্রস্তাবিত নতুন রাজনৈতিক দল কখন আত্মপ্রকাশ করবে তার একটি উপযুক্ত সময় নির্ধারণ করা যেতে পারে।

মুহিবুদ্দীন এবং মুহিবুদ্দীন ইমামদের আশ্রয়ে তারা এই আন্দোলনের
সাথে একত্রে হাটতে শুরু করে। এতদ্ব্যতীত মুহাম্মদ করিমের
পাঠশালাতে দুইটি-তিনটি শাখা আছে। বর্তমান: কামারুজ্জামান
একটি চিশূমি দাখল করে, তাই এখন দাখল হওয়া হয়েছে ১০-১৫% ভাগ
হলে তারা ইমামদের আন্দোলনের প্রতি সমর্থনের পোশাক
পায়।

৩. কিন্তু বর্তমান কামারুজ্জামান ইমামের তথ্য সংগ্রহের
ইমামের আন্দোলনের যে সমস্তই সুযোগসুবিধে তা যুগে
ব্যতিক্রম হয়। কামারুজ্জামান ইমামের দল হিসেবে কামারুজ্জামান
স্বাধীনতা চিরন্তন এবং উন্নয়ন দলের বর্তমান নেতৃত্বকে
সুখস্বাস্থ্য হিসেবে চিহ্নিত করে রয়েছে। ১৯৭০ সালে
হিসেবে এক পরিচিতিতে একটি ইমামের দল হিসেবে
হিসেবে অন্যতম মুসলিম রাষ্ট্রকে খণ্ডিত করে
হিসেবে তথ্য সংগ্রহের নামকে যেসবটিকে এককামারু-
জ্জামান আন্দোলন হিসেবে কামারুজ্জামান। তখনকার
কামারুজ্জামান কামারুজ্জামান একত্রে এখন
ইমামের সমস্ত প্রতিশ্রুতি হলে মুঠ ও পরিচিতি-
অর্থনৈতিক (চাকরি) এবং তখনকার মুঠ সংগ্রহের
সংসদ, আন্দোলন হলে। কিন্তু বর্তমান কামারুজ্জামান
আমি ও আন্দোলন দিলে পরিচিতিতে ভেদে হলে
অন্যদিকে হলে এখনে আন্দোলন-আন্দোলন প্রতিশ্রুতি
হলে। কিন্তু কামারুজ্জামান এবং আন্দোলন তখন সংগ্রহের

୭

ଏକ ସମାଜ ସାଥେ ନିଜର ତାହା ହେଉଅଛି ବିଶାଳ ସଫଳ
 ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି, ଯଦି ନିଜ ପ୍ରତିଭାକୁ ନେଇ ଭାରତର ମୁକ୍ତ
 ଅନୁରାଗିତାକୁ ୧୯୨୨ ଜାଲକୁ, ୧୯୨୫ ଦ୍ଵିତୀୟ ସଂଗ୍ରାହକ
 ଅନୁରାଗିତା ମାତ୍ର-୧୫୫-୧। ମାଧ୍ୟମିକତାକୁ, ୧୯୨୬ (୧୯୨୭) ଭାରତର
 ସାମ୍ବାଦିକ ସମାଜକୁ- ମେଳାମତି ~~କି~~ ଭାଗ୍ୟବିତ କିଏ ଏହାପାଇଁ
 ନିଜର ନୂତନ ସଂଗ୍ରାହକ ସଂଗ୍ରାହକକୁ, ସାମ୍ବାଦିକୀ ଦାବୀ
 ଦେଖିଲେ କାମ୍ୟାଳ ଆହୁରଣକରଣ ୧୫୫-୧। ବାକ୍ୟାତ ଯଦି ୨୪
 ମାଧ୍ୟମିକତାକୁ- ଅନୁରାଗିତା ମାତ୍ର ନିଜର ତାହା ନି ସଂଗ୍ରାହକର
 ଅନୁରାଗିତା କେବଳ ଲାଏ । ସଂଗ୍ରାହକକୁ, ସଂଗ୍ରାହକ ^{ସଂଗ୍ରାହକ} ବିଶାଳ
 ନିଜର ସଂଗ୍ରାହକ ନିଜର ମାତ୍ର ଆହୁରଣକରଣ ୧୫୫-୧। ୧୯୨୯ ଜାଲକୁ, ୧୯୩୧
 ନି ବାକ୍ୟାତ ନିଜର ମାତ୍ର ଆହୁରଣକରଣ ୧୫୫-୧ ମୁଖ୍ୟ ମାତ୍ର
 ୧୫୫-୧।

୫. ୧୯୪୨ ଜାଲକୁ ବିଶାଳ ମାଧ୍ୟମିକତାକୁ, ଅନୁରାଗିତାକୁ, ସଂଗ୍ରାହକକୁ
 ସଂଗ୍ରାହକ- ନିଜର ନିଜ । ଆନୁରାଗିତା ଭାରତ ବିଶାଳ ସଂଗ୍ରାହକ
 ନିଜର । ନିଜର ମାତ୍ର ଭାରତ ୩ ମାଧ୍ୟମିକତାକୁ ନିଜର
 ଅନୁରାଗିତାକୁ ସଂଗ୍ରାହକକୁ ଭାରତର ମାଧ୍ୟମିକତାକୁ । ସଂଗ୍ରାହକ
 ମାଧ୍ୟମିକତାକୁ ନିଜର ତାହା ଆନୁରାଗିତାକୁ ଭାରତର
 ଦେଖିଲେ ମାତ୍ର । ନିଜର ତାହା, ସଂଗ୍ରାହକ ନିଜର ଆନୁରାଗିତାକୁ
 ୧୫୫-୧ । ନିଜର ମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମିକତାକୁ ପ୍ରତିଭାକୁ ନିଜର
 ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ମାତ୍ର ନିଜର ଭାରତର ୧୯୪୨, ସଂଗ୍ରାହକକୁ
 ନିଜର ୧୫୫ ମାତ୍ର ସଂଗ୍ରାହକ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ମାତ୍ର

লীক হওয়ায়। তাহলে, যে স্বাধীনতা বিক্রয়ী হলে এবং, যিনি
 দ্বিতীয় স্বাধীনতা, বঙ্গদেশ, স্বাধীনতা, শত্রু ও চিন্তার
 মুক্তিযুদ্ধে, শত্রু ও চিন্তার-একমাত্র প্রচারণা চালালে
 এবং-যদি আল-মোর্শেদ বাস্তবিকই চিত্ত-দৃষ্টি দেয় এবং।
 বঙ্গদেশিক প্রজন্ম দ্বারা দিনে দিনে আল-মোর্শেদ স্বাধীন
 হওয়া, যা সমগ্র মাল নিয়ম, দুর্ভাগ্য বাক্য এবং গাঢ় ভাষা
 দ্বিতীয় যে অর্থাৎ মুক্তি ও সত্যিকার স্বাধীনতা, তাহলেই প্রকৃত
 আল-মোর্শেদ, যেদিন যখন বঙ্গদেশিক মীমাংসা, মাল-অনুগ্রহ
 দ্বারা দেখানি যেই অর্থাৎ স্বাধীনতা স্বাধীন হলে যা
 স্বাধীন এবং গাঢ় ভাষা, সত্যিকার আল-মোর্শেদ, চিত্ত-এবং
 মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধ-যদি দেখাও দেয়।
 স্বাধীনতা, বঙ্গদেশ, স্বাধীনতা, চিত্তের ও চিত্তিক বিক্রয়
 স্বাধীন হলে স্বাধীনতা স্বাধীনতা মীমাংসা। স্বাধীনতা
 যাতে স্বাধীনতা স্বাধীনতা স্বাধীনতা স্বাধীনতা এবং তাহলেই
 স্বাধীনতা চিত্তিক দৃষ্টি স্বাধীনতা, এই মীমাংসা স্বাধীনতা
 স্বাধীনতা যদি স্বাধীনতা হলে স্বাধীনতা এবং তাহলে
 স্বাধীনতা স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা স্বাধীনতা
 স্বাধীনতা, স্বাধীনতা স্বাধীনতা স্বাধীনতা স্বাধীনতা স্বাধীনতা
 দ্বিতীয় স্বাধীনতা স্বাধীনতা স্বাধীনতা স্বাধীনতা স্বাধীনতা
 স্বাধীনতা স্বাধীনতা স্বাধীনতা স্বাধীনতা স্বাধীনতা স্বাধীনতা
 স্বাধীনতা স্বাধীনতা স্বাধীনতা স্বাধীনতা স্বাধীনতা স্বাধীনতা

৬

সব সময়ে ইসলামের দল ও ব্যক্তিগত সংস্কারের ক্ষেত্রেই
মেনে নিয়, সীল মুক্তে ফার লুদ। অন্য, তাহাজ ২৯ ৪৭ সালে
খদি সাদিকের পর হুজর তাহাল হে আবদে, অধিক
সংস্কারের প্রধান। ২৯ ৪৭ সালে, সাদিকের পুত্র
কর না হলে আবদে, সাদিকের পুত্র হে এতে
সুসিকের একে হুজর। টাওয়ার ১৪৫৯ হে সাদিকের
কর্তব্য পোস্তার।

৫. কামারুজ্জামান ইসলামী, অন্য সংস্কারেই মুক্তি পান এই
ব্যাপারে, ১৮, ২৯৭৯ সালে সংস্কারের সাদিক নতুনভাবে
একটি দল হিসাবে আবদে সাদিকের পরে, অধিকতর সাদিক
এই ইসলামের দুইদলে অধিকতর ও স্বতন্ত্র করে
এই সংস্কারে সংস্কারের প্রধান, অধিকতর প্রধান
এই মুক্তিপত্রের প্রধান হিসাবে ১৪৫৯ খৃ. সালে,
২৯৭৯, ১৮ হিসাবে অন্য, সাদিক হিসাবেই মুক্তি
পান মুক্তি পান। ১৪৫৯ সালে সাদিকের কামারুজ্জামান
অধিকতর প্রধান হিসাবে সংস্কারের প্রধান।
অধিকতর সাদিক, সাদিকের প্রধান, সাদিকের, সাদিকের
সাদিকের প্রধান হিসাবে ১৪৫৯ সালে সাদিকের প্রধান
কামারুজ্জামান হিসাবে সাদিকের প্রধান এবং কামারুজ্জামান
সাদিকের প্রধান হতে হতে। অধিকতর প্রধান, অধিকতর
সাদিকের প্রধান অধিকতর প্রধান হতে হতে এবং সাদিকের
অধিকতর। সংস্কারের প্রধান অধিকতর প্রধান হতে

৮

স্বাধীনতা সংগ্রামের অঙ্গ হিসেবে গৃহীত। ইসলামের নামে অর্ধেক সার্বভৌমত্ব
এই ক্ষেত্রে দু'বারিচি যে দেশটি-ইসলাম, ইসলামিক এবং ইসলামের দোহাই
দিয়া ইসলামকেই কেন্দ্র করে গঠন এবং আন্তর্বিহীনতা এর দেশটির
সংস্কৃতি বহন, দায় এবং অসংস্কৃত মতাদর্শ ত্যাগে নিবন্ধ, মাঝে মাঝে
সেখানে গড়া। বাংলাদেশে বাংলাদেশ ইসলামের বর্তমান নেতৃত্ব এবং
সিদ্দিক তরফে ২০১৩ বাংলাদেশে নেতৃত্ব দিচ্ছেন না এবং ~~নেতৃত্ব~~
আফগানিস্তানে বাংলাদেশে সংস্কৃত দিচ্ছেন না তখনই তার স্বাধীনতা
চিরকালের অস্তিত্ব অস্তিত্ব এবং তখনকেই মুদ্রাসংক্রান্ত
সিদ্ধান্ত চিহ্নিত করে। জিহাদে মারাত্মক দাঁড় করা হয়েছে।

৭. একদম ঠিক যে মুদ্রাসংক্রান্ত, জিহাদে, জিহাদে একই মতামত
হয়। অসংস্কৃত জেদ মুক্তি নিজেই জিহাদে নিবন্ধিত এবং জিহাদে
সার্বভৌমত্ব, ২০১৫ এর সাময়িক পর্যায়ে, জিহাদে, ২০
২০১৩ জামান- আন্তর্বিহীন দুইই ইসলাম এবং তার বহন এবং
২০১৪ জামান অসংস্কৃত- সাময়িক ৩ এবং ২-এ
সিদ্দিক, দুইটি, মারাত্মক ২০১৫ এর চিহ্নিত মুদ্রাসংক্রান্ত
অন্য ৫, সাময়িক সাময়িক, তার ২০। এও অসংস্কৃত
সিদ্দিক অসংস্কৃত মারাত্মক, অসংস্কৃত, যে জিহাদে
জিহাদে ২ এবং ৩, জিহাদে অসংস্কৃত জেদ মুক্তি এবং
২০১০ জামান, মারাত্মক, মারাত্মক অসংস্কৃত মারাত্মক।
এতে অসংস্কৃত ৩৭০০ এবং ৫০০ মারাত্মক এবং মারাত্মক
মারাত্মক, মারাত্মক, অসংস্কৃত এবং ৩ মুদ্রাসংক্রান্ত জেদ
মুদ্রাসংক্রান্ত অসংস্কৃত সিদ্দিক তরফে মুক্তি এবং ২০।

আইনটি প্রণয়নের লক্ষ্যে, ট্রাইব্যুনাল, বিশেষ ^{তরফদার} ~~সি.এম.এ.~~
সি.এম.এ. ~~অর্থাৎ~~ ^{এক} ~~সংগঠিত~~ ^{কর্তৃপক্ষ}
সহিত ^{কর্তৃপক্ষ} ^{এই} ^{ইস্যু} ^{বিষয়} ^{বন্ধন} ^{এবং} ^{সংগঠন}
আনয়ন হইয়াছে। ^{এই} ^{প্রকল্প} ^{সম্বন্ধে} ^{কোন} ^{প্রশ্ন} ^{আসিলে}
বিজ্ঞানসন্মত ^{মতামত}, ^{এবং} ^{এই} ^{সংগঠিত} ^{কর্তৃপক্ষ} ^{সংগঠিত}
হইবে।

১১. কামারুজ্জামান, হকিমুল উলুম ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ২/৪ এর ~~অধিদপ্তর~~
দেখি ~~ক~~ ^{কামারুজ্জামান} ^{সংগঠিত} ^{কর্তৃপক্ষ} ^{এবং} ^{কোন} ^{সংগঠিত} ^{কর্তৃপক্ষ}
বিদানের লক্ষ্যে, ^{সংগঠিত} ^{কর্তৃপক্ষ} ^{এবং} ^{কোন} ^{সংগঠিত} ^{কর্তৃপক্ষ}
কোন বিদানের লক্ষ্যে, ^এ ^{এক} ^{সংগঠিত} ^{কর্তৃপক্ষ} ^{এবং} ^{কোন} ^{সংগঠিত} ^{কর্তৃপক্ষ}
কোন ^{এবং} ^{কোন} ^{সংগঠিত} ^{কর্তৃপক্ষ} ^{এবং} ^{কোন} ^{সংগঠিত} ^{কর্তৃপক্ষ}
দিয়ে ^{কর্তৃপক্ষ} ^{এবং} ^{কোন} ^{সংগঠিত} ^{কর্তৃপক্ষ} ^{এবং} ^{কোন} ^{সংগঠিত} ^{কর্তৃপক্ষ}
আইন ^{এবং} ^{কোন} ^{সংগঠিত} ^{কর্তৃপক্ষ} ^{এবং} ^{কোন} ^{সংগঠিত} ^{কর্তৃপক্ষ}
যুক্ত ^{কর্তৃপক্ষ} ^{এবং} ^{কোন} ^{সংগঠিত} ^{কর্তৃপক্ষ} ^{এবং} ^{কোন} ^{সংগঠিত} ^{কর্তৃপক্ষ}
আইন ^{এবং} ^{কোন} ^{সংগঠিত} ^{কর্তৃপক্ষ} ^{এবং} ^{কোন} ^{সংগঠিত} ^{কর্তৃপক্ষ}
যুক্ত ^{কর্তৃপক্ষ} ^{এবং} ^{কোন} ^{সংগঠিত} ^{কর্তৃপক্ষ} ^{এবং} ^{কোন} ^{সংগঠিত} ^{কর্তৃপক্ষ}
আইন ^{এবং} ^{কোন} ^{সংগঠিত} ^{কর্তৃপক্ষ} ^{এবং} ^{কোন} ^{সংগঠিত} ^{কর্তৃপক্ষ}
যুক্ত ^{কর্তৃপক্ষ} ^{এবং} ^{কোন} ^{সংগঠিত} ^{কর্তৃপক্ষ} ^{এবং} ^{কোন} ^{সংগঠিত} ^{কর্তৃপক্ষ}
আইন ^{এবং} ^{কোন} ^{সংগঠিত} ^{কর্তৃপক্ষ} ^{এবং} ^{কোন} ^{সংগঠিত} ^{কর্তৃপক্ষ}
যুক্ত ^{কর্তৃপক্ষ} ^{এবং} ^{কোন} ^{সংগঠিত} ^{কর্তৃপক্ষ} ^{এবং} ^{কোন} ^{সংগঠিত} ^{কর্তৃপক্ষ}

ফিলসফি না হলে, যদি মুক্তি দলে গুলুও মোঃ সত্য্য জামাত
 স্বাধীনতা বিপ্লবী এবং মুদ্রাসংকটী হিন্দুত্বের জামাত
 মোসলিম গুলু মোঃ হুসেইন ইতিহাসেই মোসলিম দেকের
 অসম্মত হি অসম্মত- কামাতের মুক্তি অসম্মত জামাত?
 ফিলসফি এর ফিলসফি ইক্বিটীর কলিও মোঃ কামাতের
 মোসলিমত এর কামাতের কামাতের দ্বারা মোসলিম
 অসম্মত স্বাধীনতা মুদ্রাসংকটী অসম্মত অসম্মত এর
 হি মোঃ হুসেইন? অসম্মত স্বাধীনতা মোসলিম কামাতের
 মোসলিম মুদ্রাসংকটী মোঃ হুসেইন অসম্মত কামাতের হি
 মুদ্রাসংকটী কামাত অসম্মত অসম্মত মুদ্রাসংকটী?

২৪. পরিচয়টি লই হুসেইন স্বাধীনতা অসম্মত মোসলিম
 অসম্মত কামাতের মোসলিম মুদ্রাসংকটী মুক্তি মোসলিম এর মুদ্রাসংকটী
 মোসলিম মুক্তি। অসম্মতের নির্দেশ মোঃ স্বাধীনতা পরিচয়
 মুদ্রাসংকটী পরিচয় হুসেইন স্বাধীনতা। যদি স্বাধীনতা পরিচয়
 ২৫ তুলুও অসম্মত মোসলিম কামাতের মোসলিম হি অসম্মত মুদ্রাসংকটী
 পরিচয় লই। স্বাধীনতা মোসলিম মোঃ কামাতের হি স্বাধীনতা মোসলিম
 মুদ্রাসংকটী হুসেইন। অসম্মতের হুসেইন মোসলিম স্বাধীনতা
 মোসলিম মুদ্রাসংকটী হুসেইন। স্বাধীনতা মোসলিম হুসেইন। হুসেইন
 মুদ্রাসংকটী মোসলিম মুদ্রাসংকটী হুসেইন। স্বাধীনতা কামাতের- নির্দেশ মোসলিম
 স্বাধীনতা মোসলিম। কামাতের স্বাধীনতা মোসলিম মুদ্রাসংকটী
 হুসেইন মোসলিম মুদ্রাসংকটী মোসলিম হুসেইন অসম্মত
 স্বাধীনতা, অসম্মতের হুসেইন। স্বাধীনতা মুদ্রাসংকটী

ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବାଣୀ ଯେ ଯେ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଯେ ହିତୁ । ଭବ୍ୟତା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ
 ବିଷୟ ଓ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଉପାଦାନ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ସାମାଜିକ ଓ ରାଜ୍ୟ
 ଧର୍ମାତ୍ମକ । ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଧର୍ମାତ୍ମକ, ସେହିଭଳି ବିଷୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ
 ବିଷୟ ଓ ବିଚିତ୍ରତା ଯେ ଯେଉଁ ଧର୍ମାତ୍ମକ, ଯେଉଁ ବିଷୟ, ସମାଜିକତା,
 ସାମାଜିକ, ସମାଜିକ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ବିଷୟ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ
 ବିଷୟ ଓ ଉପାଦାନରେ ବିଷୟ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଯେ ଯେ ବିଷୟରେ
 ଧର୍ମାତ୍ମକ ଓ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ । ଧର୍ମାତ୍ମକ
 ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟ ଓ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ, ଧର୍ମାତ୍ମକ, ଧର୍ମାତ୍ମକ । ଧର୍ମାତ୍ମକ
 ଓ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ।

୧୦. ଯେ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ
 ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ
 ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ।

୧୧: ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ
 ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ
 ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ
 ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ
 ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ
 ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ।

୧୨: ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ
 ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ
 ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ
 ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ
 ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ
 ଧର୍ମାତ୍ମକ ଧର୍ମାତ୍ମକ ।

দায়িত্ব স্বীকার করে। সেক্ষেত্রে ইচ্ছিত স্বাধীনতা, বেলা ১ মাসের জন্য
'সে' বন্দী হতে।

২৭. জামায়াতের সামান্য যে ভিতরী বিকলতা-কথা আমি উল্লেখ
করাইনি অথবা এতে প্রত্যয়, সত্যিকার-হতে যদি দ্বিতীয় বিকলতার
প্রশ্নে হয় তাহা জামায়াত যেহেতু ৩০ মাসের অবধি কাম নেই
ইতোমহে দরদে দুই-এক মাসের পরামর্শ ২০% ভায়েক জনসংকে
একটি মাসের জামায়াতে প্রতি আদে করে একই দিখু করা যিক
হীচর এতে জামায়াতে অসম্মান্য হয় তাহা। তার পরামর্শ
ইতোমহে স্বাধীনতা, যে এতদে অসম্মান্য করেই স্বাধীনতা
জামায়াতে, আনন্দিতমহেই মাসের। জামায়াতে, মাসে এতদে
মাসের, মাসে এতদে, মাসের, মাসের এই জামায়াতে প্রায়
নেত-মাসের- জামায়াতে এই মাসের, মাসের, মাসের, এতদে
আমিইইই ইতোমহে মাসের। তাহা, এতদেইইই এই
এতদে- মাসের জামায়াতে মাসের, মাসের, মাসের এই মাসের
দায়, মাসের মাসে মাসের। জামায়াতে যদি একটি স্বাধীনতা
প্রায়ইইই মাসের মাসের মাসের মাসের। তাহা, মাসের মাসের
মাসের মাসের মাসের- এই মাসের মাসের মাসের মাসের
মাসের মাসের মাসের মাসের মাসের মাসের মাসের মাসের
মাসের মাসের মাসের মাসের মাসের মাসের মাসের মাসের
মাসের মাসের মাসের মাসের মাসের মাসের মাসের মাসের

২৮. জামায়াতে যে মাসেরই ইতোমহে মাসের মাসের
জামায়াতে- মাসের মাসের মাসের মাসের মাসের মাসের।
মাসের মাসের মাসের মাসের মাসের মাসের মাসের মাসের

হাজিরা হাজির করিয়াও ২৩শ, তার নির্দেশে বহুই বিয়, থাকে।
 ২৪শ, জামায়াত তার বহুই দূর হাজিরা নির্দেশে জামায়াত
 হিতম। বিধি এই নীতি, সর্বশেষের হয় ২৫শ। জামায়াতের
 জামায়াতের হয় ২৬। ২৭শ, ২৮শ, ২৯শ, ৩০শ, ৩১শ, ৩২শ, ৩৩শ,
 সিদ্ধান্ত নির্দেশ। ৩৪শ, ৩৫শ নির্দেশে সর্বশেষের ৩৬শ জামায়াত
 দ্বারা ৩৭শ। দ্বিতীয় চক্রের নির্দেশে ৩৮শ সর্বশেষ
 পূর্ণাঙ্গ দ্বিতীয় জামায়াত ৩৯। ৪০শ ৪১শ নির্দেশে দ্বিতীয়
 ৪২শ। জামায়াত নির্দেশে পূর্ণাঙ্গ জামায়াত পূর্ণাঙ্গ
 দ্বিতীয় ৪৩শ, ৪৪শ, ৪৫শ, ৪৬শ, ৪৭শ, ৪৮শ, ৪৯শ।
 ৫০শ, ৫১শ, ৫২শ, ৫৩শ, ৫৪শ, ৫৫শ, ৫৬শ, ৫৭শ, ৫৮শ, ৫৯শ,
 ৬০শ, ৬১শ, ৬২শ, ৬৩শ, ৬৪শ, ৬৫শ, ৬৬শ, ৬৭শ, ৬৮শ, ৬৯শ,
 ৭০শ, ৭১শ, ৭২শ, ৭৩শ, ৭৪শ, ৭৫শ, ৭৬শ, ৭৭শ, ৭৮শ, ৭৯শ,
 ৮০শ, ৮১শ, ৮২শ, ৮৩শ, ৮৪শ, ৮৫শ, ৮৬শ, ৮৭শ, ৮৮শ, ৮৯শ,
 ৯০শ, ৯১শ, ৯২শ, ৯৩শ, ৯৪শ, ৯৫শ, ৯৬শ, ৯৭শ, ৯৮শ, ৯৯শ,
 ১০০শ।

২৩. জামায়াত ২৪শ, ২৫শ, ২৬শ, ২৭শ, ২৮শ, ২৯শ, ৩০শ, ৩১শ, ৩২শ, ৩৩শ, ৩৪শ, ৩৫শ, ৩৬শ, ৩৭শ, ৩৮শ, ৩৯শ, ৪০শ, ৪১শ, ৪২শ, ৪৩শ, ৪৪শ, ৪৫শ, ৪৬শ, ৪৭শ, ৪৮শ, ৪৯শ, ৫০শ, ৫১শ, ৫২শ, ৫৩শ, ৫৪শ, ৫৫শ, ৫৬শ, ৫৭শ, ৫৮শ, ৫৯শ, ৬০শ, ৬১শ, ৬২শ, ৬৩শ, ৬৪শ, ৬৫শ, ৬৬শ, ৬৭শ, ৬৮শ, ৬৯শ, ৭০শ, ৭১শ, ৭২শ, ৭৩শ, ৭৪শ, ৭৫শ, ৭৬শ, ৭৭শ, ৭৮শ, ৭৯শ, ৮০শ, ৮১শ, ৮২শ, ৮৩শ, ৮৪শ, ৮৫শ, ৮৬শ, ৮৭শ, ৮৮শ, ৮৯শ, ৯০শ, ৯১শ, ৯২শ, ৯৩শ, ৯৪শ, ৯৫শ, ৯৬শ, ৯৭শ, ৯৮শ, ৯৯শ, ১০০শ।

- ২) আলোচনায় লক্ষ্য রাখা হইবে যে আলোচনা পুস্তিকা হইতে যেমন কোনও তথ্য সংগ্রহ করা হইবে। আলোচনায় লক্ষ্য রাখা হইবে যে আলোচনা পুস্তিকা হইতে যেমন কোনও তথ্য সংগ্রহ করা হইবে। আলোচনায় লক্ষ্য রাখা হইবে যে আলোচনা পুস্তিকা হইতে যেমন কোনও তথ্য সংগ্রহ করা হইবে।
- ৩) বর্তমান সংস্কারের আলোচনায় আলোচনা পুস্তিকা হইতে যেমন কোনও তথ্য সংগ্রহ করা হইবে। আলোচনায় লক্ষ্য রাখা হইবে যে আলোচনা পুস্তিকা হইতে যেমন কোনও তথ্য সংগ্রহ করা হইবে।
- ৪) আলোচনায় আলোচনা পুস্তিকা হইতে যেমন কোনও তথ্য সংগ্রহ করা হইবে। আলোচনায় লক্ষ্য রাখা হইবে যে আলোচনা পুস্তিকা হইতে যেমন কোনও তথ্য সংগ্রহ করা হইবে।
- ৫) আলোচনায় আলোচনা পুস্তিকা হইতে যেমন কোনও তথ্য সংগ্রহ করা হইবে। আলোচনায় লক্ষ্য রাখা হইবে যে আলোচনা পুস্তিকা হইতে যেমন কোনও তথ্য সংগ্রহ করা হইবে।
- ৬) আলোচনায় আলোচনা পুস্তিকা হইতে যেমন কোনও তথ্য সংগ্রহ করা হইবে। আলোচনায় লক্ষ্য রাখা হইবে যে আলোচনা পুস্তিকা হইতে যেমন কোনও তথ্য সংগ্রহ করা হইবে।
- ৭) আলোচনায় আলোচনা পুস্তিকা হইতে যেমন কোনও তথ্য সংগ্রহ করা হইবে। আলোচনায় লক্ষ্য রাখা হইবে যে আলোচনা পুস্তিকা হইতে যেমন কোনও তথ্য সংগ্রহ করা হইবে।

୯) ବ୍ୟାପାରୀଙ୍କ ବିକ୍ରିକରଣ ନା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାପାରୀଙ୍କ ବିକ୍ରିକରଣ-
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନୁହେଁ । କାରଣ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାପାରୀଙ୍କ ବିକ୍ରିକରଣ-
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନୁହେଁ । କାରଣ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାପାରୀଙ୍କ ବିକ୍ରିକରଣ-
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନୁହେଁ ।

୧୦) ଏହାକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ୍ୟାପାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ।
ଏହାକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ୍ୟାପାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ।
ଏହାକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ୍ୟାପାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ।

୧୧) ଏହାକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ୍ୟାପାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ।
ଏହାକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ୍ୟାପାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ।
ଏହାକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ୍ୟାପାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ।

୧୨) ବ୍ୟାପାରୀ- ମୁକ୍ତି ବ୍ୟାପାରୀ, ଏ ପ୍ରକାର, ଏ ବ୍ୟାପାରୀ ଏହାକୁ
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରେ । ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରେ ।
ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରେ । ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରେ ।

ଏହି ବ୍ୟାପାରୀ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରେ ।

ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରେ ?

ଉତ୍ତର: ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରେ । ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରେ ।
(ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରେ । ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରେ ।)

ଉତ୍ତର: ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରେ । ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରେ ।
ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରେ । ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରେ ।

ଉତ୍ତର: ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରେ । ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରେ ।
ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରେ । ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରେ ।

নতুন লোকসমূহ, হাদিৎ জামায়াতে দেওয়া যাবে। অর্থাৎ নতুন
New generation Jam'at এটি।

অন্য ক্ষুদ্র গিলাফার উদাহরণ তির অলফার শ্রমের
মতের নেতৃত্ব-উল্লাহ আল হুদুদিত এবং হুজুরসাহাবা। এদের
অভিযোগ আলাফেরে এখিলিফা মক্কা মুহাম্মাদি আলফেরে মতের দ্বারা
স্বাধীন।

তৃতীয় যে মতের নতুন নেতৃত্ব হাদিৎ জামায়াতকে
দেওয়া যাবে এবং গিলাফার দ্বারা যে যে যদি ২০১০ সালের-চৈত্র-মাসে
এদের স্বাধীনতিকে সীমাবদ্ধ করে দিলে অন্য দ্বারা দ্বারা
জামায়াত-আলাফেরে যে যে হুদুদিত দ্বারা হুদুদিত, জামায়াত
স্বাধীন যে স্বাধীন হুদুদিত দ্বারা হুদুদিত, সীমাবদ্ধ, সীমাবদ্ধ
এক স্বাধীনতিকে প্রচারণা-বেলাত জামায়াতকে অস্বাধীনতা হুদুদিত
স্বাধীনতাকে হুদুদিত-দ্বারা হুদুদিত হুদুদিত দ্বারা হুদুদিত জামায়াত
নেতৃত্ব হুদুদিত হুদুদিত-স্বাধীনতাকে স্বাধীনতাকে স্বাধীনতাকে
স্বাধীনতাকে স্বাধীনতাকে স্বাধীনতাকে স্বাধীনতাকে স্বাধীনতাকে

দ্বিতীয় যে মতের অন্য উদাহরণ দ্বারা হুদুদিত, অন্য
এক স্বাধীনতাকে হুদুদিত হুদুদিত স্বাধীনতাকে স্বাধীনতাকে স্বাধীনতাকে
স্বাধীনতাকে স্বাধীনতাকে স্বাধীনতাকে স্বাধীনতাকে স্বাধীনতাকে
স্বাধীনতাকে স্বাধীনতাকে স্বাধীনতাকে স্বাধীনতাকে স্বাধীনতাকে
স্বাধীনতাকে স্বাধীনতাকে স্বাধীনতাকে স্বাধীনতাকে স্বাধীনতাকে
স্বাধীনতাকে স্বাধীনতাকে স্বাধীনতাকে স্বাধীনতাকে স্বাধীনতাকে
স্বাধীনতাকে স্বাধীনতাকে স্বাধীনতাকে স্বাধীনতাকে স্বাধীনতাকে

৩৬

একটি অসংস্কৃত গ্রন্থে লিপিত মতবিরোধিতা আমাদেয় জন্য
 স্বস্তিগতগোচর অসংস্কৃত গ্রন্থে হলেও কোম্পানী কর্তৃক
 দৃষ্টান্ত হইবে- অসংস্কৃত গ্রন্থে অসংস্কৃত বিজ্ঞান। অসংস্কৃত
 আলোচনা তাই স্বস্তিগত হইবে। অসংস্কৃত গ্রন্থে অসংস্কৃত
 মতবিরোধিতা হইবে অসংস্কৃত গ্রন্থে অসংস্কৃত মতবিরোধিতা
 সুতরাং অসংস্কৃত গ্রন্থে অসংস্কৃত গ্রন্থে অসংস্কৃত গ্রন্থে
 উল্লেখিত অসংস্কৃত গ্রন্থে অসংস্কৃত গ্রন্থে অসংস্কৃত গ্রন্থে
 হইবে অসংস্কৃত গ্রন্থে অসংস্কৃত গ্রন্থে অসংস্কৃত গ্রন্থে
 ও অসংস্কৃত গ্রন্থে অসংস্কৃত গ্রন্থে অসংস্কৃত গ্রন্থে
 অসংস্কৃত গ্রন্থে অসংস্কৃত গ্রন্থে অসংস্কৃত গ্রন্থে।

— মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ
 ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০।
 ৭ নম্বর (বকুল), ২নং কক্ষ।
 ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, ঢাকা।

English Translation of Kamaruzzaman's Letter*

This article presents an English translation of a prison letter written by Muhammad Kamaruzzaman, the progressive Assistant Secretary General of Jamaat-e-Islam Bangladesh, to the acting leadership of the organisation. Kamaruzzaman faces an imminent death penalty from Bangladesh's flawed and vendetta-driven War Crimes Tribunal.

The letter was titled Strategy for Change and is dated 26th November 2010, by which time the author had already been detained without formal charge for over four months. It articulates a view from the progressive tendency within the party, concerned for the welfare of its members, the public at large and the political stagnation taking hold of the party.

It met with dismissal by a leadership 'stunned' by the Awami League government's persecution on one side and resistant, or unable, to reform on the other. Following a frosty reception with its intended readership, it was leaked and published in the vernacular daily Kaler Kontho newspaper.

Our knowledge of Muhammad Kamaruzzaman's experience in the dock at the country's War Crimes Tribunal is less developed than those of more headline hitting leaders. A website (<http://kamaruzzaman.info>) developed by his family goes some way to humanise him and elaborate on the trial proceedings and highlight discrepancies. The son of a Sherpur businessman, Kamaruzzaman turned 19 during the Bangladesh war and later studied journalism at Dhaka University. He denies the charges ranged against him, for which the Tribunal has sentenced him to death.

* **Source:** <http://www.khichuri.org/jamaats-kamaruzzaman-and-his-strategy-for-change-progressive-yet-condemned/>

In recent weeks, Geoffrey Robertson QC, an independent and international authority on crimes against humanity published a report detailing the structural and procedural unfairness of the Tribunal. The report is constructive, inclusive and critical, outlining clear steps for internationalisation, truth and reconciliation on the issue.

Kamaruzzaman's party, despite the rhetoric of its avowed enemies and many of its supporters, is not monolithic. This letter's discussion presents us with the opportunity to listen for internal debates to which the public rarely have access. It is our hope that making this letter accessible to the English-reading audience humanises an individual who has been demonised and persecuted. In order for meaningful societal dialogue to occur, we are required to allow different parties to communicate in their own terms and listen to each other.

Notes on the translation

This letter has been sub-titled for English reading audiences at home and abroad and edited for brevity. The full text of the Bangla language original can be found online. The translation is verbatim, with the exception of editorial notes for clarification that are to be found distinguished by square brackets. The letter precedes a number of major relevant world events, notably the Arab Spring/Winter.

We enter the letter at the point where Kamaruzzaman begins to outline a three-pronged fork in the road for the party, to deal with its current situation. Previously he has introduced Jamaat's experience in Bangladesh with respect to other Islam oriented parties in the Middle East and the extraordinary crisis confronting it. This crisis is discussed as the successful and continual labelling of Jamaat as anti-liberation for the purposes of Divide and Rule. The campaign of vilification is said to have been, and is, most successful amongst the elite, educated class.

Highlighting the strategic public interest basis of Jamaat's alliance with the BNP, and its history, he relates various arguments deployed by the Indian side to try and pull constituent partners

apart and how the war crimes issue, used against many people who were not even members of the party during the war is a political instrument in the narrowest sense, and is socially amplified through the media. In addition, the Tribunal is argued to distract the public from political misrule, social degeneration and the release of dangerous criminals into the populace.

Before addressing the three options for Jamaat as he saw them, Kamaruzzaman discusses the government's strategy on the party from where he was in 2010, and that most of the cards were the government's to play.

The long extract can be read here-

A Strategy for Change

Thoughtful and wise decisions are needed to fix Jamaat's strategy under these circumstances.

One of the strategies is just to wait for the end and to see what is in store for Jamaat in future; to just continue and run the organisation as before. If the government terminates its activities against Jamaat then we shall see what we can do at that time. Otherwise, we should not ease our efforts and struggles.

Considering the total picture it is very important for Jamaat to change its strategy. This is because:

- The government has made Jamaat a political target
- Jamaat has been accused of serious allegations like war crimes and has been branded as the party of war criminals
- A section of our people have reservations, misconceptions and negative impressions of Jamaat
- The image of many Jamaat leaders has been shattered awfully, though they are very popular among party workers and well-wishers
- A section of our people show an extremely intolerant

attitude towards Jamaat

- Most importantly, a considerable part of our population has faith in Jamaat and support Jamaat for its honesty, integrity and sincerity

A other option would be to let Jamaat continue its activities from its current position. However, now it is high time that we built a new political platform and a social movement to contest the orchestrated anti-religious [islamophobic] efforts.

Jamaat should form this party with the consent of its members. Otherwise it will not be acceptable to the workers and supporters of this organisation.

The third alternative is the retirement of those Jamaat leaders from politics who have been accused of war crimes committed during the Liberation War of 1971, and the reorganisation of Jamaat with entirely new leaders. The leadership of Jamaat should be handed over to the new generation. Since Jamaat has been enduring unjust torture and persecution since 1971, for the sake of the continued development of the country's Islamic movement and for the purpose of increasing its dynamism if the present leadership step aside, then what will the Islamophobic quarters have to say? It is however true that whoever works for Islam will face no shortage of allegations from the anti-religious entities.

It is mentionable here that Islami Chattra Shibir was only able to spread and reach its present respectable status due to its establishment under a new name. The organisation would not have been able to operate under any previous name. However, since Chattra Shibir is the primary recruiting centre for the Islamic movement, it has been made controversial by the non-religious forces as well. The parties most concerned by the rise of Shibir are the communist forces and the power hungry; hence the prevalence of a torrent of lies and falsehood against Shibir. The other student organisations that work amongst the students lack any viable moral based ideology. They are usually sister parties of the ruling party or other parties solely focused on going to power and based on

following respective personalities. Such student outfits have little to offer for the nation and are usually deeply involved in corruption, tender grabbing, possession politics, admission business and seat business among others for their mere existence. If the nation is to business and seat business among others for their mere existence. If the nation is to be recovered from the politics of personality worship, there is no alternative to moral based ideology politics.

Besides reforming Jamaat, reform in the student's wing is also necessary. Students should not work as a political tool and should be kept away from direct political activities. Importance should be given on seeking knowledge, debate, discussion, building character and sound physical and mental health. They must say no to party politics, addictions and narcotics.

I believe it would be wiser for Jamaat to take the second among the three alternative strategies I have mentioned here. Jamaat has been working in this country for more than 60 years and at least 10% of Bangladesh's population support Jamaat. So they should not do anything or take any step that will ruin their image.

The fact is, the ground for Islamic politics that has been created in Bangladesh is actually an outcome of Jamaat's movement and struggle. Jamaat has developed a passionate relationship with the people of Bangladesh and the senior leaders of Jamaat have contributed a lot to achieve this success. It is thanks to their honesty and sincerity that now Jamaat is the largest and most influential Islamic movement in Bangladesh. If Jamaat uses all of its strength to establish a political platform and tries to organise a social movement, then nobody will be able to directly attack that political platform.

Responding to the Changing Situation

The anti-religious quarter may run massive propaganda campaigns against Jamaat, but it will be a mistake for them to overlook Jamaat. In this extraordinary situation Jamaat has to take the decision of adopting an alternative strategy. Jamaat was established in 1941 when the Pakistan movement was at its peak, after the approval of

the 1940 Lahore Resolution. At that time millions of Indian Muslims were dreaming of a separate state of their own. In 1947 even before Partition Jamaat leaders gave directives on their working procedure in a divided India by holding several regional conferences. Although the founder of Jamaat [Maulana Maududi] with some of his followers moved to Pakistan, many of its workers and leaders stayed in India. They continued their activity there but in Pakistan Jamaat brought revolutionary changes to its movement and started open political activities.

At one point Jamaat did not allow lawyers to be party members [since many of the legal injunctions are not in accordance with Islamic principles of justice] but to cope with reality this criteria was changed and the lawyers were allowed to join Jamaat with full membership. Earlier Jamaat did not participate in general elections, even just to cast their vote. The Indian Jamaat still does not participate in the general elections. Members were allowed to cast their vote only once in its history: when Indira Gandhi imposed the state of emergency in India. In Kashmir, Jamaat is separate from the Hindustan Jamaat. They are independent and they take part in general elections. In the past Jamaat used to nominate only its senior members to participate in elections using their ticket. Now they have changed their mindset and have opened their nomination to their supporters and other workers also. They have decided to send female members to parliament and have even nominated them for elections.

In the last Upazila Elections (2009) Jamaat nominated 24 female candidates and 12 of them won the elections. Then Jamaat did not use photographs of candidates in their publicity materials such as on posters and banners. However, now they are using photographs. Jamaat has amended its constitution and opened party membership for non-Muslims so now a non-Muslim too can be a registered member of Jamaat-e-Islami. Female Jamaat members can be elected onto the party's advisory council. All these reforms have been undertaken for the sake of the movement to meet the demands of the current situation.

Learning from Transnational Experiences

In today's difficult and challenging situation, it is a demand of wisdom and vision that Jamaat should search for alternative strategies. It is not at all any kind of deviation. Rather it is a positive evolution, which is essential for any kind of political movement. We can take example from the Muslim Brotherhood of Egypt. Without reviving the party, they are taking part in the general elections independently or under the banner of different political parties. The Brotherhood is 'not there' however its existence is everywhere. They have been working for years patiently and participating in the general elections. In Jordan, the Brotherhood have been maintaining a relationship of cooperation with the government and playing an important role in the country's politics and elections; they have participated in the coalition government.

The Brotherhood in Algeria have separated itself from the original Brotherhood and been working as Islamic Front. In Yemen they have been working with traditional Islamic parties under the banner of Al Islah Party. Having been in a coalition government earlier on, now they have left the coalition. In Morocco the Brotherhood have been working as the Justice and Development Party. They are now the main opposition party and have the possibility to return better results in the coming elections. In Sudan Islamists have been working as the Islamic Movement of Sudan and alongside the government of General Hassan Al Bashir. However, there is a conflict with a senior leader and he is not in the government. His name is Dr Hassan Turabi, the former Prime Minister of Sudan.

The Islamic movement in Turkey has changed its name many times. After inter-party split following disagreement with former Prime Minister Nazmuddin Erbakan, a movement called The Justice and Development Party (AKP) formed and established government; they have been running the country successfully under the leadership of Abdullah Gul and Recep Tayyep Erdogan. They are empowered by the members and resources of the Nur Jamaat movement formed by Bediüzzaman Said Nursî. After winning the recent referendum, AKP leader and Premier Erdogan

thanked Fethullah Gulen for his immense contribution [the author writes at a time prior to the AKP-Gulen split]. Fethullah Gulen was one of the leaders of the movements established by Bediüzzaman Said Nursî which has been pushing the Islamic movement of Turkey to a successful future. They have kept themselves behind the scenes. Islamic movements in Indonesia and Malaysia have adopted realistic strategies to cope with the current situation. Therefore under the current challenging circumstances it is high time for Bangladeshi leaders to take the movement to a new dimension by adopting realistic alternative strategies.

Seizing the Opportunity

There is an attempt to strangle the Islamic movement and eliminate it by bringing false allegations of war crimes and labelling it anti-liberation. We have failed to address or resolve this political conflict; many of us thought that this issue would resolve itself at one time anyway. This matter is being used as a burning issue against us, which was beyond many of our imaginations. The government is determined to do something in this regard. The image of the party and the leadership have been devastated by this issue and the people have developed a negative impression against the party and the leadership. For all these reasons it is now of utmost necessity to adopt a new strategy and a new political approach.

If we fail to adopt a new strategy, history will not forgive us. We shall be responsible to history because we had raised hopes among a large number of people. Hundreds and thousands of people have expressed their solidarity with us. Many of our students and youth have sacrificed their entire life; they have embraced martyrdom, lost limbs and are still fighting for the sake of the movement.

Therefore if we take the first way and let the movement go as it is, we will prove ourselves a worthless party. We should be on alert beforehand. The third way is also not a solution. Not only the local anti-religious quarter, but the international entities with similarly aligned interests are also a major threat. They are also waiting to hinder our development. For this reason such an alternative

strategy will not prove very helpful right now. Our adopted strategy should keep ensuring the faith and loyalty of the people at the fore.

The situation is critical. We should think neutrally and altruistically. We will not be able to obtain any solutions if we think only from our own point of view. It is not at all harmful if it looks like Jamaat has been broken apart. Rather we should take this path for organising a new movement for the sake of our deen [way of life].

Expanding on the Second Option

1. Considering the Constitution of Bangladesh, we should form an organisation that will not face any constitutional questions. Justice and good governance should be its motto. In this regard the organisation can be formed along the lines of the structure and manifesto of the AKP. However, their structure and manifesto are too repetitive and lengthy. For Bangladesh, it has to be brief and adapted for the conditions and demands of the Bangladeshi populace, and certain issues of public demand have to be highlighted.
2. The concept of a shadow cabinet has to be adopted with an equal number of departments formed corresponding to each ministry. A full member would have to be the responsible person for each department and an associate member would assist them. A central committee would be formed with these members and a single member should not be given more than one role. The organisational structure should be more decentralised.
3. An advisory council would be established and senior citizens, experts and Islamic scholars would be its members.
4. A council of Islamic scholars, or a Shariah Board will exist which will conduct research on various issues and will draw solutions to various problems. There must be dedicated effort to ensure Islamic unity.
5. Nobody would remain as President or District President for more than three terms at a stretch. Bengali language has to be

- used for party titles and posts. Usage of information technology has to be ensured in all steps of the organisation.
6. Representatives from all professions would have to be included in the central committee and a definite manpower analysis has to be conducted in this regard. Manpower shortage in any particular sector in one year would have to be pre- determined.
 7. There would be a secretariat that will observe the function of various departments but will not control their activities. They would coordinate but not enforce anything.
 8. There would be a committee in every department. Those committees will run independently. Highest usage of technology would be ensured in the committees.
 9. There will be a Legal Aid committee. Besides providing legal assistance, it will solve internal problems of the party and will also work as an arbitrary court on behalf of the centre.
 10. The priority should be given to: a) Education b) Social Work c) Health d) Media e) Business and Commerce f) Student Movement
 11. In elections, at first priority should be given to local government elections. Potential candidates should run their activities from now on to build personal capacity for the election.
 12. Counselling campaigns should be organised at the district level for people of different professions such as lawyers, teachers, businessmen, etc.
 13. Jamaat has already established an infrastructure. It has many associated organisations and these should be re-activated. They have been running dimly and now change is essential. They all have resources and gradually they have to be changed and made dynamic. There are many resourceful organisations and trusts at the district level. Educational institutions can be developed into world-class institutions. A plot owned by WAMY [World Association of Muslim Youth, of which Shibir is an affiliate] in Safipur can be utilised to establish an institution of global standards. Besides these the organisations that are working in divisional headquarters can be extended and reinforced. By

establishing top quality schools and colleges in every district we can recruit the best manpower of our society.

The fact is if we can utilise our existing resources in the mentioned sectors, we will be able to reach a considerable stable stage in our movement within five or ten years. If necessary we will call back our expatriates to the country and when necessary we will export our resourceful manpower abroad.

14. Cricket, football and hockey teams should be formed under the youth department. Clubs for different sports can be formed.
15. A professional institute for international language training can be formed where students will be able to study different spoken languages such as English, Arabic, French, German, Mandarin, Japanese, Korean, etc.
16. Activities of the University of Thought must continue under any circumstances. It has to be dynamic, extended and reinforced.
17. We can purchase the Daily Bhorer Dak newspaper and it can be converted successfully into a four page capital centred daily. A pool of journalists has to be developed and they would be designated to different media (print and electronic). A think tank has to be developed.
18. Children's welfare activities and cultural activities can be run under the current structure but should be more dynamic.
19. A social and working relationship would be developed with the non-Muslim community. A band of highly dedicated workers is necessary in this sector. A group will work dedicatedly for welfare of the indigenous people.
20. A group has to be established immediately by and for the RMG [readymade garment sector] workers. It can be a huge employment opportunity; this sector will prove a lifeline for Bangladesh's economy.
21. A campaign should be launched to drum up support for proportional voting. It is necessary to decentralise governance by dividing Bangladesh into several provinces. 160 million people face towards the capital and this is causing a severe

problem for good governance. The movement should be more social than political.

Under these changed circumstances, discussion should be conducted among the members regarding accepting the new strategies. Wholehearted effort is necessary to reach a consensus in this regard.

Jamaat has taught us discipline and we must maintain this within the organisation. We should bring change to our organisation while maintaining this discipline. Our manpower is searching for an alternative strategy. Our country and the international community will welcome the new direction gladly.

Those without foresight or who want to maintain the organisational inertia might oppose the proposal, but they are also very sincere. Everybody should be counselled with patience. Under this crucial circumstance and at this historical turning point, adopting an alternative strategy by reaching a consensus or at least by the vote of the majority is now what the situation demands

On Being Captive

Here I am writing my feelings once again on my captive life; captivity under false charges, which are the results of political rivalry and the rise of anti-religious politics.

1. There is no possibility of my release until the current government moves from power, which is not at all possible in the near future.
2. There is no possibility that any movement will be able to free us. There is no possibility that any street movement or agitation will be able to overthrow the government.
3. In this tenure of the government some of us will face mock trials because this issue has reached the point of no return.
4. We will not get any justice from the so-called tribunal. It is a black law. The government will be able to do whatever it wants to do with us according to this black law.
5. Many countries may express their regret recognising that

Jamaat's leaders are being persecuted, but they will not do anything to support us.

6. The international community may raise questions on the transparency of the trial process but they will not be unhappy to see an Islamic party cornered and weakened by this process.
7. Even though Jamaat will not be banned, the image of its leadership will be destroyed after their trial on war crimes and sensitive issues like opposing the nation's liberation.
8. Even if the government does not ban Jamaat, they will never permit Jamaat to work in comfort and will always keep the party under pressure.
9. Under these circumstances Jamaat will never be able to become a platform of the mass people; it will be impossible for them to form government by winning a landslide victory in the general election.
10. I can see no possibility for Jamaat to achieve good results in the next election after this term of the government.
11. Due to our love and emotion for the party we cannot think of anything without Jamaat. If anyone wants to do something bypassing the party, misunderstanding and vendetta will be inevitable. That will not be acceptable to our manpower.

Taking Action

We have become stunned at this point in time. Now the question is, what is actually in store for our future?

1. Let it be. We will remain as we are now. (Currently we are following this strategy)
2. Considering the changing circumstances, Jamaat will organise a new platform and remain behind the scenes. This organisation will tackle the anti-religious quarter with wisdom and determination.

3. Among us, those who have been convicted of war crimes will step down from leadership positions and hand over the party reigns to an entirely new leadership.

According to my understanding the first way is actually the act of foolishness and pessimism. A dynamic movement cannot take such an outdated strategy.

We could compromise with the third strategy if we could solve the issue of 1971 politically. However, the way Jamaat's image has been destroyed in the media, in the textbooks and to our youth, it will not be able to revive its image even if it brings new leadership in its pavilion.

According to my thoughts the second strategy is the most pragmatic one. Other Islamic countries have become successful by following this strategy. We have a lot of examples in front of us like Turkey, Egypt, Sudan, Yemen, Morocco, Indonesia, Malaysia and Jordan where the Islamic movement has adopted an alternative strategy.

Beside it we should also consider another point. In no other country have the leaders of an Islamic movement faced such sensitive allegations like war crimes and opposing the country's struggle for independence. We must admit that though the Islamic movement in Bangladesh has the potential to become a successful movement, these allegations have produced a massive obstacle to achieve political success and acceptance. For the time being the opponents of the Islamic movement have succeeded.

We are being tried at present as we have failed to solve this issue politically. We did not lead Jamaat in 1971, and although Jamaat supported it politically, they were not involved with the Liberation War. Those of us who are facing allegations at this moment, we did not participate in war nor were we part of any military or paramilitary body. It is out of the question that we committed crimes like rape, plundering and destruction. Today Jamaat is the victim of political vengeance for being politically active. The allegations against us are all false and fabricated. The government

is spreading misconceptions against the Islamic movement by blaming us with false charges.

Therefore we should resign from our positions so that there will be no chance of confusion and misinterpretation.

If we take this kind of initiative, for the time being it may look like degradation for us but in the long run it will be considered as an icon of greatness and pragmatism. Many of us are now quite old too. How much can we contribute to the movement at this age?

Therefore we should think of the second strategy collectively. I pray and hope that Allah will enable us to take the right decision at the right time. Ameen.

Muhammad Kamaruzzaman

November 26, 2010

7 Cell (Bokul), Room No. 2

Dhaka Central Jail, Dhaka, Bangladesh.

